প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহারা এবং তাঁহাদের মস্তকস্বরূপ মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল অনেক পরিমাণে আপনার এবং স্বজাতির সম্মানরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই জন্যই কেম্বুইকপ্রমুখ ইংরাজগণ তাঁহাদিগের উপর সন্তুষ্ট নহেন, এবং সেই জন্যই এই নূতন সভার আবির্ভাব হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বালকমাত্র, তাঁহাকে নাচাইয়া গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দেওয়া বড় কঠিন কার্য্য নহে।

কিন্তু যাহা হউক, আমাদিগের এই অনুভব সম্পূর্ণ সত্য হউক আর না হউক, দ্বারভাঙ্গার নবীন মহারাজা এবং তাঁহার অনুগামী বেহারস্থ অন্যান্য বড় লোকেরা যে কয়েক জন ভারতদ্বেষী ইংরাজের হস্তে অবশেষে ক্রীড়াপুত্তলিকাস্বরূপ হইয়া পড়িলেন, ইহাই আমাদের প্রধান আক্ষেপের বিষয়। তাঁহারা স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যায়ানুগত যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি কিম্বা আক্ষেপ নাই, কিন্তু ঘরের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদিগকে কয়েক জন বিদেশীয়, বিজাতীয়, এবং স্বজাতিবিদ্বেষী ইংরাজের আয়ত্তাধীন হইতে দেখিলে আমাদের বড়ই দুঃখবোধ হয়। কিন্তু যাহা হউক বেহারের অধিবাসীরা দেশের কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে এই প্রথম যোগ দিয়াছেন মাত্র; অতএব প্রারম্ভেই যে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইতে এবং স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইতে পারিবেন এমন আমরা আশা করি না। কিন্তু আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, শিক্ষিত বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেন আত্মবিস্মৃত না হন। বিজাতীয়দিগের বিদ্বেষবাণে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর যাহাদিগকে আমরা মান্য করি, সাধারণ লোকেরা যাঁহাদিগকে পিতৃবৎ ভক্তি করে, সেই মহামান্য শিক্ষিত বঙ্গীয় জমীদারসম্প্রদায় যদি স্বজাতীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবিদ্বেষী বিদেশীয়দিগের শরণাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে, সভ্যজগতে আর আমাদের মুখ তুলিবার স্থান থাকিবে না।

২। শিল্প এবং বিজ্ঞানশিক্ষাসম্বন্ধে যেরূপ, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যসম্বন্ধেও আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকদিগের একত্রীভূত চেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংরাজেরা এদেশে আসিবার অনতিপূর্ব্বে এখানকার ব্যবসায়ের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে আজকালের সভ্যতার হিসাবে যে অত্যন্ত কম ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাও কিছু ছিল, তাহা ইংরাজদিগের পদার্পণমাত্রেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নূতনভাবে নূতন রাস্তায় আবার এই ব্যবসায়বাণিজ্য আমাদের মধ্যে দেখা দিতেছে। কিন্তু এসম্বন্ধে যে টুকু আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। কেন না, তাহাতে আমাদের নিজের কোন ক্ষমতা লক্ষিত হয় না, বরঞ্চ পদে পদে পরমুখাপেক্ষিতা দৃষ্টিগোচর হয়। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ব্যবহারোপযোগী অনেক শিল্প দ্রব্যাদি আমদানি করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রধানতঃ প্রভূত শস্যাদি লইয়া যান। এই আমদানি এবং রপ্তানির বার্ষিক সমষ্টি অর্দ্ধশত ক্রোর টাকার কম নহে। গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনী প্রভৃতিতে বৎসর বৎসর এই

কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই যে অসাধারণ বাণিজ্য ব্যাপারটী হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই ইংরাজদিগের, অর্থাৎ তাহা সম্পাদনার্থ যাহা কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাহা ইংরাজ বণিকেরাই দিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা হইতে মূলতঃ যে লাভ হয়, তাহা তাঁহাদেরই হস্তগত হয়। গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশিত হয় যে, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের বার্ষিক মূল্য এত ক্রোর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার লাভালাভে ভারতবর্ষের লোকের কিছুই অংশ নাই। তবে দ্রব্যাদি আমদানি এবং রপ্তানি করিবার জন্য দেশের অভ্যন্তরে যে 'খরিদ বিক্রী' হয়, তাহাতেই আমাদের সংশ্রব আছে। তাহাতেও অনেক স্থানে, এবং অধিকাংশ বৃহৎ কার্য্যে ইংরাজ বণিকেরা আমাদের স্থানাধিকার করিয়া আছেন। তবে মোটের উপর, সমগ্র দেশের প্রত্যেক লোকের কার্য্য সমষ্টি করিলে অবশ্য অনেক টাকার আভ্যন্তরিক বাণিজ্য নয়নগোচর হয়। কিন্তু একথা মনে করা উচিত, যে এই বাণিজ্যের মূল,—ইংরাজ, তিনি যদি একদিন আপনার কার্য্য বন্ধ করেন, আমাদিগেরও সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। আমদানি না হইলে বিক্রেতার দোকান চলিবে না, রপ্তানি না হইলে খরিদের কার্য্য চলিবে না। অবশ্য ইংরাজেরা যখন এই আমদানি এবং রপ্তানি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তখন তাঁহারা কেনই বা তাহা বন্ধ করিবেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিদেশীয় তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিছুতেই চিরস্থায়ী কিম্বা একভাবে থাকিতে পারে না। মিসরে সমর বাঁধিল; সুয়েজ খালের রাস্তা বন্ধ হইবার সম্বাদ রটনা হইল; আমরা একবারে হতাশ্বাস! দেশের মধ্যে খরিদবিক্রী সমস্ত বন্ধ হইল! ইহার কারণ এই যে, যাহা কিছু আমরা করিতেছি, তাহার ভাবী ফলাফল সমস্তই ইংরাজদিগের ইচ্ছা, কিম্বা অবস্থার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা নাই। ইংরাজের প্রসাদে অবশ্য আমাদের মধ্যে অনেকগুলি লোক এক প্রকার সম্পন্নাবস্থ হইয়া 'বড় মানুষ' নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং ব্যবসায় করিয়া এক বৎসরে লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই, আপনাদিগকে ধনকুবের মনে করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন একটী লোক আছেন কি না সন্দেহ, যাঁহার একখানি নিজের জাহাজ আছে, কিম্বা নিজে স্বাধীন ভাবে সেই জাহাজ দ্বারা বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তৎপরে এরূপ সম্পন্নাবস্থ ব্যবসায়িদিগের সংখ্যাও এত কম যে, ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশে তাহা গ্রাহ্যই হইতে পারে না। এমন অবস্থায়, আমাদের দেশের উপস্থিত ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যে ভাল, তাহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? কিন্তু ইহা কি দুঃখের বিষয় যে, যে দেশে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদবিক্রয় করিয়া ইংরাজজাতি অদ্য পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বোচ্চধনশালী হইয়া উঠিয়াছেন, আর আমরা সেই দেশের অধিবাসী হইয়াও অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছি!!

আমাদের দেশের লোকের ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই বলিয়াই যে এই অনর্থ ঘটিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই আমাদের দেশে ব্যবসায়বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহাদের একে

টাকা নাই; দ্বিতীয়তঃ, সকল কার্য্যের এবং সকল উন্নতির মূলীভূত কারণ যে বিদ্যা এবং বুদ্ধি, তাহাও নাই। সুতরাং তাহাদের দ্বারা আর বাণিজ্যের কি উন্নতি হইবে? দেশের শিক্ষিত লোকেরা এই ব্যবসায়বাণিজ্য হইতে একবারে পৃথক্, না তাঁহাদের ইহাতে প্রবৃত্তি আছে, না উৎসাহ আছে। তাহার উপর আবার দেশের ব্যবহার এবং বিজ্ঞলোকদিগের শাসন এবং অনুজ্ঞা দ্বারা সর্ব্বদাই তাঁহারা উহা হইতে পৃথক থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। এমন অবস্থায় দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের যে প্রচলন এবং উন্নতি হইতেছে না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ইহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, এই পুরাতন রীতি অক্ষুণ্ণ থাকিলে আর আমাদের রক্ষা নাই। কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকদিগের ইহা হইতে পৃথক থাকিলে আর চলিবে না। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই এ কথা বিবেচনা করা উচিত, এবং যাহাতে এই উদাসীনতা অচিরে দূরীভূত হয় তাহার উপায় বিধান করা উচিত। আমাদের জাতীয় স্বভাবের এই কদর্য্য দোষ আমাদের চরিত্রে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং তজ্জন্য আমরা এরূপ অপদার্থ হইয়া গিয়াছি, যে সুধু সময়ের গতির উপর ছাড়িয়া দিলে, ইহা কখনই সংশোধিত হইবে না। ইহার জন্য আমাদের বিশেষ ও অসাধারণ 'রকমের' চেষ্টা আবশ্যক। এক জনের চেষ্টায় হইবে না, এক জনের উদ্যমে হইবে না; সমস্ত শিক্ষিতসম্প্রদায়কে একত্রিত হইতে হইবে, এবং একত্রিত হইয়া, সাক্ষাৎ কার্য্যের দ্বারা এই 'কার্য্য-বিহীনতার' ভাবটি দূরীভূত করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে যাহাতে এই ব্যবসাবাণিজ্যের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে যাহাতে ইহার ভাবে উদ্দীপ্ত হন, তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন না আমরা সকলে মিলিয়া দল বাঁধি। 'আসল' কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এতৎসম্পর্কীয় শিক্ষা দেশমধ্যে সম্যক্রূপে প্রচারিত করিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নাই। আলস্য, উদাসীনতা, অনবধানতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি অতি সংমিশ্র দোষ সকল বহুকাল হইতে আমাদের জাতীয় জীবন কলুষিত এবং অপদার্থ করিয়া রাখিয়াছে; আর তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। দেশের দুর্দ্দশা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও দেশের জন্য কষ্টানুভব করিয়া থাকেন, অবশ্য তাঁহার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার জন্য দেশের স্থানে স্থানে আজকাল যেরূপ সভা এবং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আমাদের ইচ্ছা, দেশমধ্যে এই ব্যবসায়বাণিজ্য প্রচারিত করিবার জন্যও সেইরূপ হয়।

৩। মিসরীয় ব্যাপারটী ক্রমশই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে মিসর রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন হইবারই, খুব সম্ভাবনা। কিন্তু তৎসঙ্গে, পাছে ইংলণ্ড ভয়ানক বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া পড়েন, ইহাই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। তবে, আজকাল ইংলণ্ড এবং ইয়ুরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের প্রতি সৌভাগ্যলক্ষ্মী [illegible]

সানুকূলা, ইহাই এক কথা। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের রাজ্যে যে কার্য্য হয়, তাহার শেষও মঙ্গলময়,—তুমি আমি কেবল নিমিত্তের ভাগীমাত্র। ইয়ুরোপীয় জাতিরা আজকাল, বলে হউক, কৌশলে হউক, ন্যায়ে হউক, অন্যায়ে হউক, সমগ্র পৃথিবীটাই আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দিন দিন যেরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ যে তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হইবে, তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু একালে ইয়ুরোপ হইতে যে উন্নতি এবং সভ্যতাস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সমস্তজগৎকে সমাচ্ছন্ন করিবার জন্যই যেন বোধ হয়, পরমেশ্বর ইয়ুরোপীয়দিগের হৃদয়ে এরূপ দুর্দ্দমনীয় বিরাট আশা এবং ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা তাঁহার,—তিনি ইচ্ছাময়, ইয়ুরোপীয়েরা কেবল তাঁহার হস্তস্থিত যন্ত্রমাত্র। কিন্তু উপস্থিতে, তাঁহাদের স্বার্থপরতা এবং পররাজ্যলোভ দর্শন করিলে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সুখবোধ হয় না। মিসরে ইংরাজের সংস্রবসম্বন্ধে সকলেরই এই মত। মিসরের কিনারা দিয়া ভারতবর্ষে আসিতে হয়। সেই জন্য ইংরাজেরা অল্পে অল্পে তাহার সঙ্গে (অবশ্য প্রথমে সখ্যভাবে) সংস্রব সংস্থাপিত করিলেন। ক্রমশঃ একটু স্বার্থবোধ হইল; দেশের অবস্থাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তৎপরে ব্যবসায় এবং বাণিজ্য করিবার ছলে সহস্রে সহস্রে তথায় গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিসরের শাসনের অবস্থা অতি মন্দ;—তাঁহাদের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের সুবিধা হয় না;—আপনারা বলশালী ও বুদ্ধিশালী, একটু একটু করিয়া তথাকার শাসনকার্য্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। যাহাতে দেশরক্ষা হয়, যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হয়, যাহাতে প্রজাবর্গের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রধান চেষ্টা হইল। পরামর্শের উপর পরামর্শ দিতে লাগিলেন, একটা বিপদ উপস্থিত হইলে, হয়ত অর্থ কিম্বা লোকবল দিয়াও সাহায্য করিলেন। কিন্তু এইখানেই সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইল। অর্থ এবং লোকবল অমনি হয় না, ঋণস্বরূপ প্রদত্ত হইল। এইরূপ প্রক্রিয়া কিছুকাল চলিল। কিন্তু কিছুকাল পরে সেই ঋণের সমষ্টি এত বাড়িয়া গেল যে, আর তাহা হইতে পরিত্রাণ নাই। তখন ইংরেজেরা অষ্টপৃষ্ঠে চাপিয়া ধরিলেন। রাজ্যটা 'বিঘোরে' মারা না যায়; তাহাহইলে ঋণ কে পরিশোধ করিবে? অমনি সমগ্র শাসনভার আপনারা গ্রহণ করিলেন। দেশের লোকেরা তখন কেহই নহে—আপনারাই সর্ব্বে সর্ব্বা। ঠিক এইরূপ ভাবে ইংরেজেরা ইজীপ্ট দখল করিয়া রাখিয়াছেন। খেদিব কেহ নহেন—পুত্তলিকা মাত্র; ইংরাজ এবং ফরাসীরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। নামমাত্র একটী জাতীয় কাউন্সিল আছে, আরাবী পাশা সেই কাউন্সিল হইতেই ইংরাজদিগের জবরদস্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইংরাজদিগের নিকট যে ঋণ আছে, তাহার সুদ আদায় করিবার জন্য যে বন্দোবস্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা নিজে করুন, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শাসনসম্বন্ধে যত কার্য্য তাহা কাউন্সিলের হস্তে থাকা উচিত। সাম্বৎসরিক রাজস্ব বজেট্ সর্ব্বতোভাবে উক্ত কাউন্সিলের আয়ত্তাধীন হয়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা ছিল। কিন্তু ইংরেজেরা জাতীয় কাউ-

সিলকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার কারণ, শাসনের 'গোড়া' হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বজাতীয় 'অবশ্যপোষ্য' লোকেতে পরিপূর্ণ; জাতীয় কাউন্সিল যদি সে শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া কখনই এত বিদেশীয় লোক তাঁহারা রাখিবেন না। আরাবীকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। তর্কবিতর্ক ক্রমে কলহে পরিণত হইল। কিন্তু 'জন-ষণ্ড' একবার ক্রোধান্বিত হইলে আর কি রক্ষা আছে? আরাবী অমনি বিদ্রোহী বলিয়া প্রচারিত হইলেন! তাঁহাকে নিপাত করিবার জন্য এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ হইতে শত শত রণতরি সজ্জিত হইয়া ইজীপ্ট্ অবরোধ করিয়া ফেলিল। আরাবী অচিরাৎ নিপাতিত এবং নিষ্ক্রামিত হইলেন; সিংহাসনে বীর অঙ্গদের প্রপৌত্র খেদীবকে রক্ষিত করিয়া ইংরাজ ইজীপ্টের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। কিন্তু এদিকে জগৎসমক্ষে সে কথা ফুটিয়া বলা হইবে না। আরাবীর নিপাতের পর প্রচারিত হইল যে, আপাততঃ ইংলণ্ড কিছুদিনের জন্য ইজীপ্ট্ অধিকার করিয়া থাকিবেন, এবং দেশমধ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি পুনঃসংস্থাপিত করিয়াই তাঁহারা তথা হইতে প্রতিগমন করিবেন। শান্তি-সংস্থাপনকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল; শাসনযন্ত্রের 'স্ক্রু' বিলক্ষণরূপে ক্রমশই বসিতে লাগিল; ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট্ মহাসভায় প্রত্যহই বাগ্‌বিতণ্ডা হয়, কবে ইজীপ্ট্ পরিত্যক্ত হইবে? বৃদ্ধ গ্লাড্‌ষ্টোন্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—Grand old man! কত বুদ্ধির সহিত কত সময়ে কত কথাই বলেন! কিন্তু এদিকে এক আগুন নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে আর এক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এক ইজিপ্টের কুশাসন, তদুপরি অর্থলোলুপ বিদেশীয়দিগের উৎপীড়ন এবং রাজ্যের সাধারণ বিশৃঙ্খলা;—সোদানবাসীরা দেখিতে দেখিতে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া ফেলিল। সোদান এক হিসাবে ইজীপ্টেরই উপরাজ্য; মাহাদী নামধারী তথাকার এক ব্যক্তি দেশবাসী লোকদিগকে লইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা "উড়িয়া গিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন"—কি কর্ত্তব্য, ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা এবং পরামর্শের পর, না করিলে নয় এইরূপে বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রথমে কোন ফল হইল না, সেনাপতি হিক্স্ সসৈন্যে বিদ্রোহিদিগের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। লোকলজ্জায় ইংরাজ একটু উত্তেজিত হইলেন; এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল বন্দোবস্তের সহিত অধিকসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। দুই একটি সমরে ইজীপ্টের (অর্থাৎ ইংরাজদের) জয়লাভ হইল। কিন্তু বিদ্রোহিদিগের আপনার দেশ, একস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা স্থানান্তরে গিয়া উপবিষ্ট হইল। তথায় সেনাপতি গর্ডন প্রেরিত হইলেন; তিনি যুদ্ধ করিবেন না, 'বাপু বাছা' বলিয়া বিদ্রোহশান্তি করিবেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা সে কথা শুনিবার লোক নহে, তাহারা শেষ পর্য্যন্তও যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প। গর্ডন এক্ষণে সুয়াকিম নামক স্থানে চতুর্দ্দিকে সমরানল পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়াছেন। সম্বাদ আসিয়াছে যে, তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। এই শোচনীয় 'ইজিপ্টীয়' ব্যাপারটি গর্ডনের মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হয়

হয়, এক্ষণে ইহাই সকলের ভয় হইয়াছে।

আমরা বলি, এরূপ বৃথা গোলযোগ এবং অযথা নিঃস্বার্থপরতার ভান না করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইংরাজদিগের অচিরাৎ ইজীপ্ট্ দখল করিয়া বসাই উচিত। কিছু দিন পরে, তাহাই করিতে হইবে। খেদিবের দ্বারা আর রাজ্য চলিবে না, তবে কেন আর তাহাতে বিলম্ব করিয়া অনর্থক একটী সমগ্র দেশের অধিবাসিদিগকে অশেষ যন্ত্রণা এবং উচ্ছিন্নতায় প্রক্ষিপ্ত করা হয়? ইজীপ্ট্, নামমাত্র তুরুস্কের অধীন। আর এখনকার বন্দোবস্ত অনুসারে ফ্রান্সেরও তাহাতে কতকটা ইংরাজদিগের ন্যায় ভোগদখলের অধিকার আছে। প্রধানতঃ এই দুইটি কারণের জন্যই ইংরাজেরা প্রকাশ্যভাবে ইজীপ্ট্ অধিকার করিবার অভিপ্রায়, কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা বলি, অচিরাৎ এই দুইটি বিষয়ের সামঞ্জস্য হওয়া এবং কাহারও না কাহারও কর্ত্তৃক দেশ অধিকৃত হওয়া উচিত। আরাবীপাশাকে পুনরাস্থান করিয়া আবার দেশবাসিদিগের হস্তে আভ্যন্তরিক শাসনের ভার প্রদান করিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হয় বটে; কিন্তু যথায় উদ্ধত ইয়ুরোপীয়দিগের কর্ত্তৃত্ব, এবং যথাকার রাজা পরের হস্তে কাষ্ঠ পুত্তলিকামাত্র, তথায় এরূপ সদ্বন্দোবস্তের কোন সম্ভাবনা নাই।

৪। সুরেন্দ্রবাবু সিভিল সার্ভিস ও ন্যাশন্যাল ফণ্ড্ সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছেন। আজ বৎসরাধিক হইল, ন্যাশনাল ফণ্ডের কথা উঠিয়াছে; সুরেন্দ্রবাবুই একপ্রকার ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহা সংগ্রহের চেষ্টা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে সমর্থ হয়েন নাই। 'পেটের ভাতের' জন্য তাঁহাকে স্কুলমাষ্টারি করিতে হয়; সুতরাং অবকাশ নাই। এক্ষণে গ্রীষ্মাবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাও মহৎ। কিন্তু প্রকৃতির যে মহত্ত্ব থাকিলে মনুষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে একটী উচ্চদরের নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী হইতে পারেন, সে মহত্ত্ব তাঁহাতে নাই। আমরা তাঁহাকে নিন্দা করিতেছিনা; বরঞ্চ শত সহস্র বিষয়ে তিনি আমাদের প্রশংসা এবং ধন্যবাদেরই পাত্র, কেন না তিনি যে টুকু করিয়া থাকেন, তাহাই বা 'এ পোড়া দেশে' কয়টা লোক করিয়া থাকে? কিন্তু তাই বলিয়া সুরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে আমাদের যে টুকু আক্ষেপ হয়, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অসাধারণ কঠিন শাসনে আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; এতদিন নির্ব্বিকার অবস্থায় মনের সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এখন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিয়াই দেখিতেছি যে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারেই পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। এমন অবস্থায়, আমাদের হইয়া যে দুইটা কথা বলে, তাহারই উপর সমস্ত লোকের চক্ষু নিপতিত হয়; আবার সে ব্যক্তি যদি স্বদেশীয় হয়, তাহা হইলে তাহার উপর ভক্তি এবং অনুরাগের সীমা পরিসীমা থাকে না। সকলে সে ব্যক্তিকে

দেবতা বলিয়া মানিয়া লয়, এবং তাহার সকল কার্য্যেই প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ প্রদান করে। এই কারণেই অদ্য ভারতবর্ষে সুরেন্দ্র-বাবুর এত সমাদর, এই কারণেই সুরেন্দ্রনাথ অদ্য হিন্দুমুসলমান সকলেরই এত পূজ্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে পরিমাণে আমরা সুরেন্দ্রনাথকে সমাদর করিলাম, পূজা করিলাম, ধন্যবাদ দিলাম,—সুরেন্দ্র নাথ কিন্তু সে পরিমাণে আপনার জীবনের সার্থকতাসম্পাদন করিতে সক্ষম হইলেন না। এখনও যে তাহার সময় নাই, তাহা আমরা বলি না, সুরেন্দ্রনাথ এখনও যুবা পুরুষ, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, দুঃখিনী ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে এখনও বহুদিন যেন সুরেন্দ্রনাথ জীবিত থাকেন, কিন্তু যে জীবন সার্থকতার কথা আমরা বলিতেছি, তাহা আর যে সুরেন্দ্রনাথের জীবনে সম্ভব হইবে, এমন বোধ হয় না। এইজন্যই আমাদের আক্ষেপ।

নিঃস্বার্থপরতা, হিন্দুচরিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ, হিন্দুজাতি ভিন্ন সন্ন্যাসী ও সর্ব্বত্যাগী লোক এত আর কোন জাতির মধ্যে নাই। লোকে বলে ভারত অদ্য কুনীতির অধস্তন সোপানে অবতীর্ণ, কিন্তু আজিও ভারতে সহস্র সহস্র সর্ব্বত্যাগী নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী নয়ন-গোচর হয়। নিঃস্বার্থ পরোপকার তাহাদের একমাত্র ব্রত, তাহারা ধন চাহে না, ঐশ্বর্য্য চাহে না; সুখ চাহে না, সম্ভোগ চাহে না; একমাত্র কৌপীনধারণে সন্তুষ্ট হইয়া অহরহঃ স্বজাতির এবং স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া আমাদের এই জাতীয় ভাবটুকুও ক্রমশঃ অপহরণ করিয়া লইতেছে। এখন আর কেহ সন্ন্যাসী হইতে চাহে না; "আপনার গণ্ডা" ছাড়িয়া কেবল পরের জন্য জীবনপাত করিব—এরূপ আর কেহ ইচ্ছা করে না। ঘোর স্বার্থপরতা—নিকৃষ্ট, সঙ্কুচিত, অল্পাযত স্বার্থপরতা এক্ষণে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রকে সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী চালচলন, ইংরাজী সম্ভোগ-ইচ্ছা, ইহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে এ সমস্ত সাধ্যমত করতলস্থ করিয়া যদি সময় এবং প্রবৃত্তি হয়, তবে দেশের উপকার করিব, নচেৎ অবকাশ কই? 'দেশের উপকার, দেশের উপকার'—এই ধুয়া আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকে ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই প্রকার। ব্যক্তিবিশেষে ভাল মন্দ আছে; কিন্তু মোটের উপর প্রায়ই এই রকম। বলিতে বড় দুঃখ হয়, যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্যকরূপে উক্ত দোষবিবর্জ্জিত নহেন।

সকলেরই মনে আছে, হাইকোর্টের অবমাননার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাসদণ্ড হইলে, সমস্ত ভারতবর্ষের লোকটা কি প্রকারে তাঁহার জন্য দুঃখ এবং শোক প্রকাশ করিয়াছিল। যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যথার্থ বিস্মিত হইয়াছিলাম, এবং মনে ভাবিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানকালে সমগ্র ভারত-বাসিদিগের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী পুরুষ আর কেহ নাই। কিন্তু তত কাণ্ডকারখানার শেষ ফল কি দাঁড়াইল? সুরেন্দ্রনাথের জীবনের গতি কি কিছু পরিবর্ত্তিত হইল? ভারতহিতৈষী, ভারতের সুসন্তান, ভারতের ভাবিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া যাঁহাকে লোকে পূজা এবং অভ্যর্থনা করিল,

তিনি কি প্রকৃতপ্রস্তাবেই তদুপযুক্ত? কারাগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ ত কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফূর্ত্তিলাভ করিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ম্লান হইল।

ন্যাশন্যাল ফণ্ড-সংগ্রহের জন্য সুরেন্দ্রবাবু পশ্চিম গমন করিয়াছেন। পাটনা, এলাহাবাদ, আলিগড়, লাহোর, মুলতান, রাউলপিণ্ডি, অমৃতসহর, অম্বালা প্রভৃতি স্থানে সভা হইয়া গিয়াছে, সকলেই সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সভাস্থলেই অনেকে চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া প্রস্তাবিত কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শুনিতেছি, দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত যাইতে সুরেন্দ্রবাবু উৎসুক ছিলেন, কিন্তু অবকাশাভাবে তাহা এ যাত্রায় পারিলেন না। এবারে পশ্চিম হইতেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। ১০।১৫ দিন মাত্র প্রবাস করিয়াই সুরেন্দ্রবাবু ন্যাশন্যাল ফণ্ড সম্বন্ধে এতটা কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছি; কিন্তু অধিক দিন ধরিয়া স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে পারিলে যে আরও সুফল ফলিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরন্তু দেশের এরূপ বিকৃত অবস্থা যে, ভয় হয়, পাছে সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাশন্যাল ফণ্ডের কথা লোকে বিস্মৃত হইয়া যায়। যতদূর আমরা দেখিয়াছি, এবং এপর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া যতদূর আমাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই রূপ ঘটাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একজন উদ্যোগী লোকের আবির্ভাবে আমরা দারুণ উৎসাহিত হইয়া পড়ি; কিন্তু সে ব্যক্তি বিদায় হইতে না হইতেই আমাদের সমস্ত উৎসাহ বিদূরিত হইয়া যায়। এমন অবস্থায়, ন্যাশন্যাল ফণ্ডকে স্থায়ীতর ও স্থিরতর ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন এবং সুরেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কিছু চেষ্টা করিয়াছেন তদ্দ্বারা 'পাকা' ভিত্তি সংস্থাপিত হয় নাই। স্থানে স্থানে 'বেহিসাবী' সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিলে কোন স্থায়ী ফল হইবে না; কথা উঠিতে উঠিতেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সাধারণ লোকদিগকে এ বিষয়ে রীতিমত স্বার্থাপন্ন করা চাহি। কিন্তু কি করিয়া এরূপ হইতে পারে? আমাদের বিবেচনায় এজন্য মফঃস্বলের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সভা সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক এবং কলিকাতার ভারত-সভাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ সকল সভায় একই নিয়মে কার্য্য করা উচিত; নতুবা শীঘ্র সুফললাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু ভারতসভার তাদৃশ সজীবতা কই। সুরেন্দ্রবাবুর অপেক্ষাকৃত শৈথিল্যে ও ভারতসভার সজীবতার অভাবেই ন্যাশন্যাল ফণ্ড 'মস্তকোত্তোলন' করিতে সক্ষম হইতেছে না,—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যদি ন্যাশন্যাল ফণ্ডের অনুষ্ঠাতৃদিগের, উহাকে কার্য্যে পরিণত করার, আন্তরিক ইচ্ছা যথার্থই থাকে তাহা হইলে অধিকতর উৎসাহের সহিত, অধিকতর আত্মত্যাগের সহিত, কার্য্য আরম্ভ করুন কার্য্য এখনও, প্রকৃত প্রস্তাবে, আরম্ভই হয় নাই।

৫। সিভিল সার্ভিস্-পরীক্ষার্থিদিগের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে স্থানে স্থানে একবিন্দু আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু এই সামান্য আন্দোলনে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা

অতি অল্প। এসম্বন্ধে দেশব্যাপী ঘোর আন্দোলন আবশ্যক। মিলিটারি-সার্ভিসে দেশীয়দিগের অধিকার নাই, সিভিল সার্ভিসে থাকিয়াও নাই। কিন্তু দেশীয়দিগের অধিকার চুলায় যাউক। অজাতশ্মশ্রু, অপরিণতবয়স্ক বালকদিগের হস্তে একটা দেশের আভ্যন্তরিক শাসনভার দেওয়াটা কি বড় ভাল হইতেছে? ইহাতে কি অনিষ্টপাতই না হইতেছে? কেবল প্রজার অনিষ্ট নহে; সিভিলিয়ানদিগের নিজেরও বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। অনেকে কঠিন রোগগ্রস্ত হইতেছেন; অনেককে বাতুলালয়েও প্রেরণ করিতে হইতেছে। হইবে না? দুধের বালক —কাঁচাছেলে, তাদের উপর গুরুতর কঠিন কার্য্যের ভার!! বাজার কিরূপ বিবেচনা, রাজাই জানেন। 'নেটিভ'দিগের সিভিল-সার্ভিসের পথ অবরোধ করিবার জন্যই 'উনিশ বছরী' নিয়ম। কিন্তু এই পৈশাচিক নিয়ম কেন? নেটিভদিগকে স্পষ্ট বলা হউক না,—'বাপু তোমরা পাইবে না'? অনর্থক একটা অমানুষিক নিয়ম করিয়া দেশটাকে 'অধঃপাতে' পাঠান কি ভাল হইতেছে? এসম্বন্ধে কন্সার্ভেটিভ্ লিবারাল লিটন কিম্বারলি উভয়েই সমান। সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষক স্বয়ং ওয়ার্ণ্টার্ বেন এবিষয়ের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, গবর্ণমেণ্ট শুনিলেন না। শুনিবেন কেন? শুনান যাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারাই শুনাইতে জানেন না, কাযেই তাঁহারাও শুনেন না। কিন্তু কতকাল আর একপে যাইবে? সিভিলসার্ভিসের বর্ত্তমান নিয়ম সম্বন্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন ও বিবিসঙ্গত দৃঢ় প্রতিবাদের নিতান্তই আবশ্যক,—ইহা কি এখনও প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইতে হইবে? দেশে রাজনৈতিক সভার অভাব নাই। সভ্যমহাশয়েরা আর কোন্ কালে কি করিবেন? দুইটা বাক্যব্যয় করিতেও কি তাঁহারা কুণ্ঠিত? হঃ মঃ।

নানা কথা।

কি অশুভক্ষণেই 'ডিনামাইট' আবিষ্কৃত হইয়াছিল! 'মুষলঃ কুলনাশকঃ'। 'ডিনামাইটই' বোধ হয় ইয়ুরোপ ধ্বংস করিবে। কিছুকাল মধ্যেই তথায় ঐ সাংঘাতিক পদার্থের অস্বাভাবিক প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উহা দ্বারা যে সকল ঘোর পৈশাচিক কার্য্য সংসাধিত হইতেছে তাহা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে।

'নিহিলিষ্ট,' 'সোশিয়ালিষ্ট' প্রভৃতি বহুবিধ নামধেয় একটী 'নারকীয়' জাতির অভ্যুত্থান ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছে। ইহারা রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মবিদ্রোহী,—রক্তপিপাসু নরপিশাচ। এক দিকে বলবানের অত্যাচার ও পাশ্চাত্য প্রকৃতির পাশব প্রচণ্ডতা, ও অপরদিকে অঙ্গহীন আধুনিক সভ্যতা ও শিক্ষার গরলময়তা হইতে ঐ নরহন্তাদিগের উৎপত্তি হইয়া দিন দিন সংখ্যাধিক্য হইতেছে। ইয়ুরোপের এমন রাজধানী নাই, এমন প্রধান নগর নাই, যেখানে উহারা 'দলবলে' কার্য্য না করিতেছে। উহাদের প্রতিজ্ঞা যে, পৃথিবীতে রাজা ও রাজবংশ রাখিবে না; 'মুকুটধারী মস্তক'মাত্রই চূর্ণ করিবে। মনুষ্যসমাজ 'ভাঙ্গিয়া চুরিয়া' পুনরায় গড়িতে

সম্পত্তিমাত্রেরই নূতন প্রণালীতে ন্যায়ানুমোদিত বিভাগ করিয়া জগতে সাম্যসংস্থাপন করিবে। উহাদের মতে, যাহারা বৈষম্যের কারণ তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া একবারে নির্ম্মূল করা ভিন্ন 'সাম্য'-সংস্থাপনের অন্য উপায় নাই। অতএব শোণিতপাত, শিরশ্ছেদন, গুপ্তহত্যা, বিষ-প্রয়োগ, অগ্ন্যুৎপাত—'যেন তেন প্রকারেণ' নরবক্তে বসুমতীর বক্ষ কলুষিত করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত বা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছে। দুরাত্মাদিগের নারকীয় ব্রতের, পৈশাচিক পেশার ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ 'ডিনামাইট'রূপ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র করতলস্থ হওয়া অবধি এই নরপ্রেতদিগের আহ্লাদ-উৎসাহের আর সীমা নাই। আমেরিকা হইতে ক্রমাগত 'ডিনামাইট' আমদানি করিয়া রাজপথে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, শয়নকক্ষে, যথা তথা—তাহা অপূর্ব্ব কৌশলে গোপনে সংস্থাপিত করিতেছে। কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটে তাহার স্থিরতা নাই। ডিনামাইটের আতঙ্কে সমগ্র ইয়ুরোপ কম্পান্বিতকলেবর। বিলাতের চারিটী বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশন 'ডিনামাইট' দ্বারা যুগপৎ উড়াইয়া দিবার একটী অসীম সাহসিক উদ্যম সে দিন মাত্র ধৃত হইয়াছে। ডিনামাইট্, য্যাটলাস্ পাউডার নামক এক প্রকার চূর্ণের ন্যায়। কেবল আমেরিকাতেই উহার কারবার হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা তথা হইতে উহার অযথা রপ্তানি না হইতে পায়, তজ্জন্য সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

সাহেবদের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি; সকল কার্য্যেই বিশেষত্ব। স্বর্গীয় বা নারকীয় যে কোন মত ইঁহারা উদ্ভাবন করুণ, 'আদা জল খাইয়া' তাহার প্রচার করিবেন। প্রচার-কার্য্যে পাশ্চাত্য জাতি অদ্বিতীয়। সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কে 'Dynamite monthly' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ডিনামাইট্-মাসিকের উদ্দেশ্য কি তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কাগজখানির অনুষ্ঠান-পত্রের এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে,—

"ডিনামাইট! আহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহার নামও কেহ শুনে নাই; কিন্তু আজ ইহা ঘরে ঘরে পূজিত,—সমাদৃত। * * * ইহা নিপীড়কের আতঙ্কস্থল, নিপীড়িতের আশার কারণ। ইহার সর্ব্ববিনাশিনী শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই নিপীড়ককে সংহার করিয়া নিপীড়িত উদ্ধার হইতে পারিবে। ইংলণ্ডে নিপীড়ন অধিক, অতএব সে (কয়েকজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আয়ার্ল্যাণ্ড্-বাসীর হস্তে) ডিনামাইট্কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে।"

নরপ্রেতগণ যে সকল ব্যক্তির জীবন-সংহার করিবার সংকল্প করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নামের তালিকা অবধি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই তালিকায় মহাত্মা গ্লাড্ষ্টোন্ ও মিঃ ফরেষ্টারের নাম দৃষ্ট হইল। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার!!! ফরেষ্টার আয়ার্ল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড্ রিপণের পর ইঁহাকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারাল করিবার জন্য কোন কোন সহযোগী প্রার্থনা করিতেছেন।

ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আতিশয্যে, জ্ঞান-

ধর্ম্মের অসদ্ভাবে ও বৈষম্য অত্যাচারের গুরু-ভারে 'ডিনামাইট বাদ' ভারতভূমিতেও এক দিন প্রাদুর্ভূত হইবে না, ইহার প্রমাণ কি? প্রমান,—ভারতবাসীর কোমল প্রকৃতি, ভারত সন্তান নিরীহ, স্নেহশীল ও 'ধর্ম্মভীরু'। কিন্তু কালক্রমে ও অবস্থার বিপর্য্যয়ে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়াও ত সম্ভব। অতএব অগ্রেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অগ্রেই ডিনামাইট-বাদের 'সঞ্চারীভাব' বিদূরিত করা উচিত। ভারতের ভাগ্যলিপি যাঁহাদের হস্তে তাঁহারা দিন থাকিতে এ বিষয়টা চিন্তা করিলে ভাল হয় না কি?

বোম্বায়ের ডাক্তার ব্যাঙ্ক্ পল্লীবাসী নিরীহ 'বেষতের' প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিল। দণ্ড পাইয়াও পাইল না। এখন দেখা চাই, নরকুল-কলঙ্ক ওষেরের কি হয়। এই পাষণ্ডের নাম উচ্চারণ করিলেও পাপ স্পর্শে, রসনা কলুষিত হয়, অতএব ইহার পৈশাচিক অপকর্ম্মের, প্রচণ্ড মহাপাতকের সবিস্তার আলোচনা করিয়া সাময়িক পত্রের কলেবর অশুচি করিব না। কোন সহযোগী দুঃখ করিয়াছেন যে, যখন এই দুষ্ট লম্পট পতির বক্ষ হইতে সাধ্বী-সতীকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল ও স্বীয় শয়ন-কক্ষের অর্গল বদ্ধ করিয়া পতিপ্রাণার পবিত্রতার সহিত জীবনবিনাশের উদ্যম করিল,—সেই মুহূর্ত্তেই কুলিগণ দুরাচারীর 'মস্তিষ্ক বাহির করিয়া কেন ভোজন করিল না'! আমাদের বিবেচনায় কুলিদিগের তাহাই করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করিলেও দুরাত্মার উপযুক্ত শাস্তি হইত না। সে মনুষ্যাধমের মস্তিষ্ক শৃগালশকুনীরও অভক্ষ্য, মানুষে স্পর্শ করিবে কিরূপে?

অতুল প্রতিভাসম্পন্না কুমারী তরু-দত্তের নাম অবশ্য অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তরুর কবিত্বে ও ইংরেজী-ভাষা-বিজ্ঞতায় সমগ্র ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশ এক দিন চমকিত হইয়াছিল। অতি অল্প-বয়সেই তরুর মৃত্যু হয়। কিন্তু যত দিন পৃথিবীতে ইংরেজী সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাহার নাম বিলুপ্ত হইবে না। তরু কলিকাতার গোবিন্দ দত্তের কন্যা, সম্প্রতি গোবিন্দবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। গোবিন্দবাবু নিজেও কবি ও ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজীতে অনেকগুলি সুপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে বঙ্গভূমি অনেকগুলি সুসন্তান হারাইলেন। প্যারিচাঁদ, কেশবচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র—উপর্য্যুপরি কালকবলে নিপতিত হইলেন। কেশবচন্দ্র অসামান্য প্রকৃতির লোক, অতএব তাহার কথা ধরি না। কিন্তু প্যারিচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের মতও লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কয়টী আছেন?

নিম্নে যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে তদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে, ইউরোপীয় জাতীয়েরা কতকাংশে প্রতিভার সমাদর করিতে জানে। সার্ আইজাক্ নিউটনের মৃত্যুর পর তাঁহার একটী দন্ত ৭ হাজার ৩০ টাকায় বিক্রয় হয়। জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি উহা ক্রয় করিয়াছিলেন ও স্বীয় অঙ্গুরীতে বসাইয়া ব্যবহার করিতেন। ভল্‌টেয়ারের একগাছি ছড়ী তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। রুশোর একটা জামা চারি শত টাকায়

ও একটা পিত্তলের ঘড়ী দুই শত টাকায় বিক্রয় হয়। মোলেয়ার নাপিতের দোকানে যাইয়া যে চৌকিখানিতে বসিতেন তাহার মূল্য তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত টাকা হইয়াছিল। দার্শনিক পণ্ডিত কাণ্টের একটী অতি পুরাতন টুপী আশী টাকা আনয়ন করিয়াছিল।

আকা রাজ্য হইতে প্রত্যাগত 'বাবুনী' স্বীয় 'প্রবাস'-কাহিনী ক্রমশঃ সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিতেছেন। আকাদিগের আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"বুডা গাঁও নামক অদূরবর্ত্তী গ্রামে এক বৃদ্ধের বাটী অতিথি হইলাম। বৃদ্ধের নাম 'পান-দাও'। ২৫ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র, ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা পুত্রবধু, ১১ বৎসরের আর এক পুত্র, বার তের বৎসরের এক কন্যা ও তাহার মাতা লইয়া পান-দাওর পরিবার। পুত্র বধুটী দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল, পানদাওর পুত্রকন্যাও কুৎসিত নহে। এই সুন্দর পরিবারে আমরা অতিথি হইলাম। পান-দাও ও তাহার পরিবারের প্রত্যেকেই আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। বিদেশী বলিয়া বড় আদর করিত। * * * রাজা ব্যতীত অপর সকল আকাদের একটী মাত্র ঘর। বাঁশের বেড়া ও কলাপাতার ছাউনি,—আকা-দেশে গৃহ-নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। পরিবারের সংখ্যা যত অধিক হউক না কেন, সকলকেই এক গৃহে থাকিতে হয়। যতটী দম্পতী, গৃহে ততটী অগ্নিকুণ্ড। দম্পতীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে গৃহের আয়তন দীর্ঘে বাড়াইয়া একটী নূতন অগ্নিকুণ্ড প্রতিষ্ঠা করে। এতদ্ব্যতীত যবনিকাদ্বারা গৃহটীকে কুঠরিতে বিভাগ করা আকাদের বুদ্ধিতে যোগাইয়া উঠে না। এক পরিবারের সকল আকাই একই গৃহে রন্ধন করে (অর্থাৎ পচা শূকরের মাংস দগ্ধ করিয়া আহার করে), একই গৃহে শয়ন করে; একই গৃহে অবস্থিতি করে। সভ্যদেশে লজ্জা বলিয়া যে একটী মানবহৃদয়ের বৃত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—আকাদের পার্ব্বত্য ভূমিতে তাহা জন্মে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে গৃহে পান-দাও ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সস্ত্রীক বাস করিতেন, আমাদের জন্য সেই গৃহেই শয্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং আমাদের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। সেই পচা শূকরের মাংস পোড়ানর গন্ধে নাসিকা একবারে পরিতৃপ্ত হইত। সর্ব্বদাই জড়সড় হইয়া থাকিতে হইত। যাহা বলা হইল, তাহাতেই দেখা যাইবে যে, আকাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণভাবে প্রচলিত। এমন কি, বিবাহ-সম্বন্ধে আমাদের দেশে রমণী-দিগের যে অবস্থা, আকাদের দেশে পুরুষদের সেই অবস্থা। পুরুষ দেখিতে সুন্দর হইলে আকা-রমণী দয়া করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। কুৎসিত হইলে তাহার বিবাহ হওয়া না হওয়া বিধাতার নির্ব্বন্ধ। আকাপুরুষ দেখিতে সুন্দর হইলে আকা-রমণী তাহাকে অল্পবয়সেই বিবাহ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে ৯।১০ বৎসর বয়স্ক আকারও বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর কন্যার ১৫।১৬ ও পুরুষের ২৫।২৬ বৎসর বয়স না হইলে বিবাহ হয় না। আকা-রাজ্যে বাল্য-বিবাহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসভ্য আকাদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা এত প্রবল হওয়াতে আকাদেশে যে সতীত্বের

সম্মান নাই, তাহা নহে। আকাবমণীর মত সতী পতীব্রতা বমণী আমি অল্পেই দেখিয়াছি। আকাদেশে বাল্যবিবাহ নাই। অবরোধ প্রথা নাই। আকাদেশে ঘটক নাই; স্ত্রী পুরুষের মনের মিল না হইলে বিবাহ হয় না।"

আমরা শুনিলাম, বাগবাজার চট কলের সাহেবগণ তত্রত্য বাবুদিগের পরামর্শে বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সমারোহের সহিত ব্রহ্মা পূজা করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে ট্রেইল্‌সন হোটেল হইতে আনীত উপকরণ দ্বারা নিমন্ত্রিত সাহেবদিগের পরিচর্য্যা করা হয়; পরদিবস রবিবার দেশীয়দিগের আচারানুসারে হিন্দু ভোজন সম্পন্ন হয়। শুনিলাম পূজার রাত্রিতে সাহেবগণ রীত্যনুসারে প্রণামী পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। সংবাদটী আমোদ ও বিস্ময়জনক বটে। বৎসর বৎসর অগ্নিদাহে কলের সমূহ ক্ষতি হওয়াই এই পূজার প্রধানতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজের সর্ব্বনাশ—বড় ভয়ঙ্কর কথা। কিন্তু ব্রহ্মাও 'কাঁচাখেকো দেবতা'।—ইহার সঙ্গে "Damned your idolatry". খাটে না!

জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর ২০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন বালক নৃত্যগীত করিতে পারিবে না। বিবাহ-উপলক্ষে সাধারণে নৃত্যগীত করিতে পারিবে; কিন্তু যিনি নৃত্যগীত দিবেন, তাঁহাকে এরূপ বালকের বিশুদ্ধচরিত্রতার জন্য প্রতিভূ দিতে হইবে। স্যাক্সনিতে নিয়ম হইয়াছে, ২১ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কোন বমণী সাধারণে গীত গাহিয়া বেড়াইতে ও ১৭ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বমণী অভিনয় করিতে পারিবে না। সকল দেশেই এই নিয়ম অনুসৃত হওয়া কর্ত্তব্য।

পারস্যদেশে কেহ মরিলে আত্মীয়দিগের অশ্রুজল শিশিতে ছিপিবদ্ধ করিয়া তুলিয়া রাখা হয়। ভূতে ধরা প্রভৃতি অনেক উৎকট রোগের পক্ষে না কি তাহা অব্যর্থ ঔষধ!!—গ্রাঃ বাঃ।

সভ্যদেশে আত্মহত্যার ধুম কিছু বেশী। ফরাসীরা বড় আমোদপ্রিয় বলিয়া বিখ্যাত, তাহারাই আত্মহত্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!! প্রতি দশলক্ষ লোকের মধ্যে ফরাসীরাজ্যে ৪০২ জন, সুইডেনে ৩৫৭, ডেন্‌মার্কে ৩০২, অষ্ট্রিয়ায় ২৮৭, জর্ম্মণিতে ২৪০, রুশিয়ায় ২০৬, ইতালিতে ১৮০, প্রুশিয়ায় ১৭০, আমেরিকায় ১৪৪, এবং লণ্ডনে ৮৭ জন লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

ফরাসীদেশে কয়েদী সংশোধনের জন্য এক নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাহারা ৬ মাসের বেশী কারাদণ্ড পাইবে, তাহারা যদি সৎস্বভাবের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক মিয়াদ খাটিয়াই বেহাই পাইবে। এদেশীয় কারাগারসমূহে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক এম্ পাষ্টার বলিয়াছেন, কুক্কুরকে টীকা দিলে তাহার বিষ হ্রাস হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, টীকা দেওয়া কুক্কুরে দংশন করিলে জলাতঙ্ক রোগ হয় না। কিন্তু কুক্কুরের যে পরিমাণ বিষ, টীকার বিষও সেই পরিমাণে হওয়া

আবশ্যক। এটী পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কুক্কুরের দংশনে বর্ষে বর্ষে যেমন লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে, এই সহজ উপায়ে যদি তাহার নিবারণ হয়, দেশের একটী বিশেষ মঙ্গল হইবে।

জাপানের যুবতীগণের ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ হইবার নিয়ম নাই; বিবাহের পরে যুবতীদিগকে ভ্রূমণ্ডল ও দন্ত কৃষ্ণবর্ণ করিতে হয়। জাপানে স্ত্রী ও পুরুষ বিবস্ত্র হইয়া একত্র স্নান করে! শুনিতে পাওয়া যায়, জাপানবাসীরা অনেক উন্নত হইয়াছে, বোধ হয় শেষোক্ত বাক্যটী সত্য নয়।

ডাক্তার আর ই ডজিয়ন বিলাতের একখানি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সৃষ্টিকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ হ্যানিমান সাহেব ১৮৩১ অব্দে আসিয়ার ওলাউটা সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, একপ্রকার কীটাণু হইতে এই মারাত্মক পীড়া সংক্রামিত হয়। ইহা এরূপ সূক্ষ্ম যে নয়নগোচর হয় না। কর্পূরই এই কীটনাশের একমাত্র ঔষধ।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার বৃষ্টিবৃক্ষ আছে, ইহা হইতে অল্প অল্প ধারে বৃষ্টি পতিত হয়। সেই বিন্দু বিন্দু বারিপতনে বায়ু শীতল হয়। এই গাছগুলি ঊর্দ্ধে ৬০ ফুট উচ্চ। এ গাছ ভারতবর্ষে আনাইতে পারিলে অনেক কায হইতে পারে।

নরনারী যে বয়সে অধিক পাপাসক্ত হয়। তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরুষ ২০ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর এবং স্ত্রীলোকেরা ৩০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত অধিক পাপাসক্ত হইয়া থাকে।

মদ্যপানে বিলাতবাসীর যে কত অর্থ ব্যয় হয়, হভ্‌ল্‌ সাহেব তাহা গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ১৮৮৩ অব্দে তথায় ১২৫০½ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের মদ্য বিক্রয় হইয়াছে। মদের অপকারিতা লোকে যত বুঝিতেছে, মদ্যপায়ীর সংখ্যা তত হ্রাস হইতেছে। প্রতিবর্ষেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি ১৮৭৬ অব্দ হইতে বর্ষে বর্ষে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ষ্টার্লিং মূল্যের মদ্যবিক্রয় হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৬ অব্দে তথায় ১৪৭০½ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের মদ্য বিক্রয় হইয়াছিল বিলাতে প্রতিবর্ষে ১০০০০ লক্ষ গ্যালন বিয়ার ও ৩৭০ লক্ষ গ্যালন স্পিরিট্‌ খরচ হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ২০০০০ জন মাতাল; ৮৭০০০ লোক মত্ত হইয়া মারামারি করিয়া অভিযুক্ত হয় এবং ৭০০০ লোক সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ৫১০০০ রমণী মদ্যপানে মত্ত হইয়া কুকর্ম্ম করাতে কারারুদ্ধ হয়। যে সকল রমণী দুষ্কার্য্য করিয়া জেলখাটাকে অপমান জ্ঞান করে না, তাদৃশ ৯০০৪ রমণী প্রস্তাবিত বর্ষে জেল খাটিয়াছে। ১৮৬০ অব্দে তথায় ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫০½ লক্ষ, ছিল এক্ষণে ৮০ লক্ষ হইয়াছে। তৎকালে পাগলের সংখ্যা যত ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাবু গিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকা

শিত "অদ্ভুত ইন্দ্রজাল" নামক পত্রে সার্দ্ধ দুই দণ্ডের মধ্যে একবারেই শাখা প্রশাখা, পল্লব, মুকুল ও ফল সমন্বিত আম্রতরু প্রস্তুত করিবার এক আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়টী সত্য হইলে অতি বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। প্রক্রিয়া এইরূপঃ—প্রথমতঃ, একটী সুপক্ক আম্রের আঁটী গ্রহণ করিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, এই আঁটিটী যেন কাঁচা বা কচি আম্রের আঁটী না হয়। কারণ, এইরূপ আঁটীর মধ্যে আম্রের কষী নড়িয়া যায় এবং উহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাতও জন্মিয়া থাকে। অনন্তর সহী বৃক্ষ অর্থাৎ তেকাঁটা-সিজ-গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আটা সঞ্চয় করিয়া লইবে। এই তেকাঁটাসিজকে বাজরবণ-গাছও কহিয়া থাকে। এই তেকাঁটাসিজের আটাতে এই সুপক্ক আম্রের বীজটী ক্রমান্বয়ে একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া এবং একবিংশতিবার বিশুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এই সময়ে এই পক্ষে একটু যত্নবান ও সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, যেন ঐ তেকাঁটা সিজের দুগ্ধদ্বারা আর্দ্র আমের আঁটী রৌদ্রের বা অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করা না হয়। তাহা হইলে কোন ফলই দর্শিবে না। উহা ছায়াময় স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপ ঐ আঁটী সিজগাছের আটাতে একবিংশতিবার ভিজাইয়া ছায়াময় শীতলস্থানে একবিংশতিবার বিশুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, ততক্ষণ উহা আটাতে পুনর্ব্বার ভিজাইবে না। এইরূপ প্রক্রিয়া হইলে পর একটী টবে বা কোন স্থানে উত্তমরূপে কুষ্ট, চূর্ণ ও পাইট করা মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এই মৃত্তিকাতে ঐ আম্রের আঁটী রোপণ করিবে। উহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলও সেচন করিতে হইবে। সার্দ্ধ দ্বিদণ্ড কালের শেষে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ মৃত্তিকা-প্রোথিত আম্রের আঁটী হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছে। প্রথমে এই অঙ্কুর হইতে দুইটী পত্র হইবে এবং আরও কিঞ্চিৎ পরে আরও দুইটী পত্র জন্মিবে। এইরূপে যখন আট বা দশটী পত্র উদ্গত হইবে, তখন ক্রমে অনেকগুলি শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্র জন্মিতে দেখা যাইবে। প্রত্যেক প্রশাখার উপরে স্তরকে স্তরকে মুকুল (বৌল) সুশোভিত হইবে। কিঞ্চিৎক্ষণ পরেই ঐ সকল বৌল প্রস্ফুটিত হইয়া আম্ররূপে পরিণত হইবে। অতি অল্পকাল পরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ আম্রগুলি পরিবর্দ্ধিত ও পক্ক হইয়াছে। এই সকল কার্য্য অতি গুপ্তভাবে করাই বিহিত। কিন্তু ইহাতে সাধারণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যাঘাত হইল। যাহা হউক, সকলেই এই নিয়ম ও কৌশল অবলম্বন করিয়া এই কার্য্য করিলে ইহার যে কিরূপ সদ্য-প্রত্যয়কারক ফল তাহা অনায়াসেই অবগত হইতে পারিবেন।

এই বাজরবণ অর্থাৎ তেকাঁটা সিজের আটা দ্বারা যে আম্রতরুই কেবল উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহা নহে। ইহা দ্বারা নীচু, জম্বু, জম্বীর, পিয়ারা, জামরুল, কমলালেবু, তেঁতুল, কাঁটাল প্রভৃতির মধ্যে যে কোন বৃক্ষ হউক না কেন, সমস্তই জন্মান গিয়া থাকে। কিন্তু উপরি উক্ত ঐ সকল কৌশল ও প্রণালী অতি সতর্করূপে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল; আষাঢ়, প্রথম পক্ষ। [নবম সংখ্যা।

হার্বার্ট্ স্পেন্সার ও ভাবী দাসত্ব।

হার্বার্ট্ স্পেন্সার বর্ত্তমান সময়ের একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য গরিষ্ঠ নামা পণ্ডিত—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গগণের একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। অতলস্পর্শ মানসিক শক্তি ও হার্বার্ট্ স্পেন্সার একই পদার্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হার্বার্টের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা ও প্রখরা চিন্তা-শক্তি বিপুল বৈভব-সম্পন্ন ইংরাজী সাহিত্যেরও শীর্ষস্থানীয়—জ্ঞানগর্ব্বান্বিত উনবিংশ শতাব্দীরও নমস্য। হার্বার্ট্ স্পেন্সার ও তৎসদৃশ কতকগুলি মনস্বী ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রসূত ফল লইয়াই আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের এত গৌরব—এত উচ্চতা। হার্বার্টের স্বাধীন চিন্তা সুদূর-গগণস্পর্শিনী, স্বয়ং ভগবানের কৃত কার্য্যের প্রতিও কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; অন্যদীয় প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে ঘৃণা করে; নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করিয়া লয়। এই স্বানুবর্ত্তিনী চিন্তাশক্তির প্রভাবে হার্বার্ট্ বর্ত্তমান সময়ের উপর নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী-বিনিঃসৃত গ্রন্থনিচয় ভবিষ্য-বংশাবলীর মনের উপর যে রূপই কার্য্য করুক, তাহাদের কর্ত্তৃক যে সমাদৃত ও সম্মানিত হইবে, তাহাতে সংশয়াভাব। হার্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার মত ও সিদ্ধান্ত সকল গ্রন্থবিশেষে প্রকটন করিয়া স্থায়িভাব প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে প্রায়শই সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ইহাতে ফল এই হয় যে, তাঁহার উপপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের মতামত অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল মতামতের যথোপযুক্ত বিশ্লেষ ও বিচার করিয়া নিজের সিদ্ধান্তসমূহ সমর্থনপূর্ব্বক গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। কয়েকমাস অতীত হইল, হার্বার্ট্ স্পেন্সারের লিখিত 'ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণাম' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ যুগপৎ কয়েকখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি, 'কণ্টেম্পোরারী রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত বিলাতীয় মাসিক পত্রে হার্বার্ট "ভাবিদাসত্ব" (The Coming Slavery) শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, প্রবন্ধটীতে সূক্ষ্ম-দর্শন ও তর্ক-নৈপুণ্যের অভাব নাই; তবে পণ্ডিতাগ্রগণ্য লেখক 'ভবিষ্য-দাসত্বের' যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিদূরিত হইলেই যে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া অধিকতর সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, ইহা বলিতে পারি না। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও

মনুষ্যের সমবেত চেষ্টা সামাজিক উন্নতির দুইটী প্রধান উপায়; কিন্তু হার্বার্টের মতে উহারাই ব্যক্তিগত-স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় ও দেশব্যাপী 'ভবিষ্য-দাসত্বের' মূল কারণ। প্রবন্ধটীর স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

দাসত্ব কাহাকে বলে? যে ব্যক্তি অন্যের অধিকার ও শাসনাধীন, যে অন্যের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিশ্রম করিতে বাধ্য, তাহাকেই দাস বলি, অর্থাৎ যাহার কার্য্য অন্য ব্যক্তির উপকারের জন্য সেই ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিয়মিত ও অনুশাসিত হয়, তাহারই ব্যক্তিত্ব—দাসত্ব।

দাসত্বের ন্যূনাধিক্য অবশ্য সম্ভব। এক ব্যক্তি যে পরিমাণে নিজের স্বেচ্ছানুসারে নিজের বা অন্যের উপকারের জন্য কার্য্য করে, সেই পরিমাণে সে স্বাধীন,—আর যে পরিমাণে অন্যের উপকারের জন্য, অন্যের ইচ্ছাদ্বারা নিয়মিত ও অনুশাসিত হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, সেই পরিমাণে সে দাস। সংক্ষেপতঃ, যে পরিমাণে অন্যের ইচ্ছা আমার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাঘাত করে ও অন্তরায় হয়, সেই পরিমাণে আমার দাসত্ব। এই দাসত্ব যেমন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে পারে, তেমনি সমাজের নিকটও হইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের নিকটেই হউক আর সমাজের নিকটেই হউক, দাসত্ব দাসত্বভিন্ন আর কিছুই নয়।

স্পেন্সারের মতে, ইংলণ্ড্ প্রভৃতি দেশে এই দাসত্বের 'সঞ্চারী ভাব' বিবিধ প্রকার শক্তির সমবায়ে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইয়ুরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে রূপ গতি ও প্রকৃতিপুঞ্জের যে প্রকৃতির সামাজিকতার প্রতি অনুরাগ, তাহাতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত কার্য্যের হ্রাস ও সমবেত কার্য্যের বৃদ্ধি হইতেছে। সমবেত কার্য্যের বৃদ্ধিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর আঘাত লাগিতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াই দাসত্ব। স্পেন্সার বলেন, ভবিষ্যতে ইংলণ্ড্ প্রভৃতি দেশকে এই দাসত্বের সম্পূর্ণ অধীন হইতে হইবে।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লিষ্ট ও বিলোড়িত করিয়া স্পেন্সার উপরোক্ত কথা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি এই রূপ বলেন,—রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আইনের উপর আইন তার উপর আইন, ক্রমাগতই আইন হইতেছে; উহার নিবৃত্তি নাই। নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, কেননা এক বার 'আইন' করিতে আরম্ভ করিলে—ক্রমেই উহার সংখ্যা বাড়াইয়া যাইতে হইবে, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। অগ্রগামী আইনের দৃষ্টান্ত করিয়া পশ্চাদ্গামী আইন প্রস্তুত হয়। কেবল তাহা নয়; আইনের উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত না হওয়াতে এবং সংসাধিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই বিশ্বাসে,—তাহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও সংযোজন চলিতে চলিতে ক্রমেই কঠোরতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। অমিতপান-দোষ নিবারণ করিবার জন্য একটী আইন হইল। আইনটী যেরূপ কার্য্যকরী হইবে প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, সে রূপ হইল না; সুতরাং একবারে সুরাবিক্রয়-নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া হয়ত একটী আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল; তাহার

'অপরিমিত পান' নিবারিত হয় না। স্পেন্সার এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় অনেকগুলি আইনের কথা পাড়িয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টান্ত আমাদের অতি নিকটেই আছে। যথা, বঙ্গীয় প্রজা ও জমীদার সম্বন্ধীয় আইন। ১৮৫৯ সালে এই আইন যে রূপ আকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, ১৮৬৯ সাল তাহার রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। নতুবা আইনের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হয় না। ১৮৬৯ সালে উক্ত আইন যে রূপ আকার ধারণ করিল, তাহাতেও 'সম্যকরূপে উদ্দেশ্য সাধিত' হইল না। অতএব পুনরায় পরিবর্ত্তনদ্বারা আইনের কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়া প্রজা ও জমিদার উভয়েরই হস্তপদ অধিকতর দৃঢ়রূপে বন্ধন করা আবশ্যক হইল। উপস্থিত 'রেণ্ট্-বিলে' প্রজা ও জমিদার উভয়েরই স্বাধীনতা আইনের পদে 'বলিপ্রদান' করিবার জন্য যে রূপ সংকল্প করা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ১৮৫৯ সালের আইনের দৃষ্টান্তে ১৮৬৯ সালের আইন। ১৮৬৯ সালের আইনের দৃষ্টান্তে 'অদ্যকার' রেণ্ট্ বিল্। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর, তাহার দৃষ্টান্তে আবার কি প্রকার আইনের অবতারণা হইবে তাহা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। তবে উহা অপেক্ষা অধিকতর সাংঘাতিক একটী আইন সৃষ্ট হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু তা যাক্। হার্বার্ট্ স্পেন্সার বলেন, রাজনীতির যে একটা 'গতি' আছে ইহা আমাদের 'নামমাত্র কার্য্যশীল' রাজনৈতিকগণ একবারেই স্মরণ করেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থাদ্বারা যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই নিয়মিত হওয়া সম্ভব ও তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্প্রচারিত হওয়া অসম্ভব অর্থাৎ উল্লিখিত পরিবর্ত্তন তাঁহারা যতটা ইচ্ছা ততটা সংসাধন করিয়া যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই সংযমিত করিতে পারেন। কিন্তু এটা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। এই ভ্রমবশতই আইনে আইনে দেশ প্লাবিত হইতেছে।

'ব্যবস্থাপকগণ (ইংলণ্ডের) ১৮৮৩ সালে স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণার্থে দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে আদৌ বিবেচনা করেন নাই যে, তাঁহাদের ঐ ব্যবস্থা সম্প্রচারিত হইবে ও তদ্দ্বারা লোকে নিপীড়িত হইয়া চাঁদা দিতে বাধ্য হইবে এবং ঐ দুই লক্ষ আজ ছয় কোটী টাকায় পরিণত হইবে। তাঁহারা তৎকালে স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহারা যে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতেছিলেন তদ্দ্বারা 'ক'এর সন্তানের লেখাপড়ার জন্য 'খ'কে দায়ী করা হইবে এবং পীড়নপূর্ব্বক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দুঃখিনী বিধবাকে তাহার পুত্রের উপার্জ্জিত বেতন হইতে বঞ্চিত করা হইবে। তাঁহারা তৎকালে এ সকল কিছুই অনুধাবন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ফলিতার্থে এ সমস্তই আজ ঘটিয়াছে।'

পূর্ব্ববর্ত্তী আইনের 'নজির' ধরিয়া নূতন আইন ক্রমাগতই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। 'যখন উহা করা হইল, তখন ইহা করা হইবে না কেন'? গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ্-লাইন ক্রয় করিয়া তাহা চালাইতেছেন, অতএব রেলওয়ে-লাইন ক্রয় করিয়া চালান উচিত। সাধারণ বালকবালিকাদিগের মানসিক উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে

শিক্ষা প্রদান করা হয়, কিন্তু তাহাদের শারীরিক উন্নতিও আবশ্যক, অতএব কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আহার যোগাইতেছেন। এই রীতি ক্রমে প্রচারিত হইয়া যখন সাধারণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই সম্ভব যে, যখন বিনামূল্যে মনের আহার প্রদান করা হইতেছে, তখন শরীরের আহারও বিনামূল্যে প্রদান করা কর্ত্তব্য, কেননা প্রকৃষ্ট-প্রজা প্রস্তুতকরণার্থে মার্জ্জিত মন ও বলিষ্ঠ শরীর উভয়ই সমানরূপ প্রয়োজন।

গবর্ণমেণ্ট যেমন আইনের পর আইন করিতেছেন, প্রজাপুঞ্জও তেমনি আইনের পর আইন চাহিতেছে। আইন হইলেই যেন সকল কষ্টযাতনা, সকল অন্যায়-অত্যাচার, দুঃখদারিদ্র্য বিদূরিত হইবে। আইনদ্বারা দুঃখ-দারিদ্র্য-অন্যায়-অত্যাচার নির্ম্মূল হয় না; হইতে পারে না। কেবল এক স্থানের অশুভ পরিবর্ত্তিত আকারে অন্যত্র সংস্থাপিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকবারের স্থানান্তরিতকরণে উহার ভার ও পরিমাণ বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

জগতে অলস ও অমিতাচারী লোকের ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিবে, ইহা কি স্বাভাবিক? সামাজিক অশুভমাত্রই বিদূরিত হওয়া সম্ভব এবং তাহা বিদূরিত করিবার জন্য কাহারও না কাহারও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; এই উভয় মতই ভ্রমাত্মক। যে অকার্য্য করে, সে স্বভাবের নিয়মানুসারে দণ্ডনীয়; প্রকৃতি স্বয়ংই তাহাকে শাস্তি দেন। অপকর্ম্মনিবন্ধন যাতনা অবশ্যম্ভাবী। 'যে আলস্যের বশবর্ত্তী ও পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ, সে অবশ্যই অনাহারী থাকিবে।' ইহাই প্রকৃতির নিয়ম; এই নিয়মখণ্ডন করিবার চেষ্টা করা বিফল। 'অকার্য্য' হইতে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাতনাকে পৃথক্ করিতে গেলে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তিত শৃঙ্খলার উপর আঘাত পড়ে এবং তদ্দ্বারা যাতনা প্রশমিত না হইয়া আরও অধিক যাতনা আনয়ন করে। স্বাভাবিক যাতনার সঙ্গে অস্বাভাবিক যাতনার সৃষ্টি হয়।

কেহ আলস্য-অমিতাচার, ব্যসন-ব্যভিচার প্রভৃতি নানাকারণে দুঃখযাতনার আবাসস্থল হইয়াছে, তুমি তাহাকে সংশোধনাভিপ্রায়ে আবশ্যকতা-বোধে 'টিকটিকির' উপর চড়াইয়া নিয়মিতরূপে কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলে, ঘানিকাষ্ঠে জুড়িয়া দিলে। এতদ্দ্বারা তাহার অকার্য্যজনিত প্রাকৃতিক যাতনা কিয়ৎপরিমাণেও বিদূরিত হইল, ইহা তুমি বলিতে পার না। কিন্তু তুমি কশাঘাত প্রভৃতি কতকগুলি অস্বাভাবিক নিগ্রহের প্রয়োগ করিলে ইহা সুনিশ্চিত। পরন্তু তুমি রাজকীয় ব্যবস্থাদ্বারা সাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া অলস ও অমিতাচারী লোকদিগের ভরণপোষণের উপায় বিধান করিলে। বস্তুতঃ কি এতদ্দ্বারা আলস্য-অমিতাচারজনিত ক্লেশ নির্ম্মূল করা হইল? কখনই না। ইহাতে একদিকে যেমন আলস্য-অমিতাচারকে প্রশ্রয় দিয়া তাহা বৃদ্ধি হওয়ার পথ-প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল, অপরদিকে তেমনি জনসাধারণের অর্থশোষণদ্বারা অনেককে দুঃখদারিদ্র্যের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইল। তুমি আপাততঃ একের কষ্ট অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলে বটে, কিন্তু তাহা নির্ম্মূল করিতে পারিলে না; প্রত্যুত তাহা বৃদ্ধি করিলে।

এইরূপে আইনদ্বারা আইনের উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পন্ন হইতেছে না, হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আইনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। আইনের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্য চালাইবার জন্য পঙ্গপালসদৃশ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া অত্যাচার ও নিপীড়নের আকার বৃদ্ধি করিতেছে এবং পক্ষান্তরে সাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় কার্য্যের ভার ক্রমে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট আহার যোগাইতেছেন, লেখাপড়া শিখাইতেছেন, টেলিগ্রাফ ও রেইলওয়ে চালাইতেছেন, লোকের বাস করিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। সংক্ষেপতঃ ব্যবসায়ীর ব্যবসা ও শ্রমজীবীর শ্রম, গবর্ণমেণ্ট নিজে অধিকার করিয়া বসিতেছেন এবং প্রকারান্তরে (Socialist) সমাজতন্ত্রবাদিদিগের আদর্শসমিতির ন্যায় আকার ধারণ করিতেছেন। লোকে যন্ত্রবৎ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ঘুরিতেছে; কিন্তু বুঝিতেছে না যে, যে পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, সেই পরিমাণে তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বানুবর্ত্তিতা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইতেছে। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, স্বাধীনতা ও স্বানুবর্ত্তিতার বিচ্ছিন্নতাই দাসত্ব।

পক্ষান্তরে (Socialism) সমাজতন্ত্রবাদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহারও অবশ্যম্ভাবী ফল দাসত্ব। সমাজ-তন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিগত কোন কোন সম্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকার করিতেছেন এবং ভূমি ও মূলধন প্রভৃতির বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনসাধনের জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। ইঁহাদের মতে ব্যবসা-বাণিজ্য-ভূমি-ধন-ধান্য যাবতীয় সম্পত্তি বিশেষ বিশেষ স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সমগ্র সমাজের মঙ্গলার্থে প্রদান করা আবশ্যক ও সমাজস্থ যাবতীয় ব্যক্তির তাহাতে সমানরূপ অধিকার থাকা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিবে ও সমাজের নিকট হইতে নিজের ভরণপোষণোপযোগী সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে।

'মুদ্রাযন্ত্র এই মতের পোষকতা করিতেছেন ও বলিতেছেন যে, লোকে আর Socialismএর নামে ভয় পায় না। উক্ত সামাজিক পরিবর্ত্তন আবশ্যম্ভাবী ও আগতপ্রায়, অতএব সকলেরই অবশ্য গ্রহণীয়।

'এইরূপে নানাকারণের সমবায়ে সমবেত কার্য্যের বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত কার্য্যের হ্রাস হইতেছে। অতএব এই পরিবর্ত্তনেরও অবশ্যম্ভাবী ফল দাসত্ব। "All Socialism involves Slavery" দাসত্ব সামাজিকতা মাত্রেরই অন্তর্নিহিত। কেন না

'No form of co-operation, small or great, can be carried on without regulation and an implied submission to the regulating agencies.'

'ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক কোন প্রকারেরই সমবেত-কার্য্যপ্রণালী নিয়ম ব্যতীত ও নিয়ামকদিগের বশবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন চলিতে পারে না।' সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনসাধনজন্য যে সমিতি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহারই সংগঠন উল্লিখিত কার্য্যের প্রমাণ।

সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যেও সেই বিধি-ব্যবস্থা, আইনকানুন। বিধি-ব্যবস্থা-আইনকানুন থাকিলেই তাহা সম্পাদনার্থে কর্ম্মচারী প্রয়োজন ও কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে

উচ্চনিম্ন পদ ও শ্রেণী সংস্থাপনও আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কর্ম্মচারিগণই সমাজের শাসয়িতা ও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই উহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য, নতুবা শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা ও সৌকর্য্যের ব্যাঘাত হয়। স্পেন্সারের মতে প্রভুর সহিত দাসের যে সম্বন্ধ এই শাসয়িতার সহিত শাসিতেরও সেই সম্বন্ধ।

এ স্থলে কথা হইতে পারে যে, সোশিয়ালিষ্ট্ দিগের সামাজিক শাসনযন্ত্রের পরিচালকগণ যদিও এক প্রকার প্রভু হইবে, কিন্তু প্রভু হইয়াও তাহাদিগকে সর্ব্বদা শাসনাধীন থাকিতে হইবে অর্থাৎ সমগ্র সমাজের ও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারার্থে যে পরিমাণে 'সুশাসন' নিয়মিত করা আবশ্যক তাহার অধিক ও অতিরিক্ত ক্ষমতা তাহাদিগের থাকিবে না।

এই তর্কের প্রত্যুত্তরে হার্বার্ট্ স্পেন্সারের প্রথম কথা এই যে, 'যদিও শাসয়িতৃদিগের ক্ষমতা প্রকৃষ্টরূপে নিয়মিত করা সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলেও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সমগ্র সমাজের নিকট দাসত্বসূত্রে বদ্ধ। প্রত্যেকেরই কার্য্যসমষ্টি ও পরিশ্রম সমাজের অধিকারাধীন; এবং এই কার্য্য ও পরিশ্রমের জন্য সমাজ নিজের ইচ্ছানুসারে যাহা দিবেন, তাহাই সমাজস্থ ব্যক্তিমাত্রের গ্রহণীয়। যদি এরূপ শাসন বিশেষ সন্তর্পণ ও সদাশয়তার সহিত চলে, তাহা হইলেও দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী; তবে তাহার তীব্রতা কিঞ্চিৎ অল্প হইতে পারে।'

স্পেন্সারের দ্বিতীয় কথা এই যে, 'দাসত্বের তীব্রতা কোন ক্রমেই অল্প হইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না বর্ত্তমান সমাজ যে মনুষ্য প্রকৃতির সমষ্টি, সোসিয়ালিষ্ট্ দিগের শাসন সমিতিও সেই মনুষ্যপ্রকৃতি লইয়া সংগঠিত হইবে; অতএব মনুষ্যপ্রকৃতির অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতাজনিত অমঙ্গল বর্ত্তমান সমাজকে যেরূপ দূষিত করিতেছে, সোশিয়ালিষ্ট্ দিগের শাসন সমিতিকেও তদ্রূপ দূষিত করিবে। অন্যায় অসত্য অত্যাচার, আত্মম্ভরিতা, ক্ষমতাস্পৃহা, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতির দুর্ব্বলতানিচয় সমবেত সম্প্রদায়বিশেষকে সচরাচর যেরূপ বিপর্য্যস্ত করে, সোশিয়ালিষ্ট্-শাসনসমিতিকেও সেই প্রকার বিপর্য্যস্ত ও কলুষিত করিবে। অধিকন্তু মানবপ্রকৃতির ঐ সকল দুর্ব্বলতাজনিত ব্যভিচারের ফল উক্ত সমিতিতে ধারাবাহিকভাবে বর্ত্তিবে ও অধিকতর অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। কেন না ঐ বিবিধ শক্তি ও স্বত্বসম্পন্ন বিরাট সমিতি একবার সম্প্রসারিত হইয়া দাঁড়াইলে, 'রশ্মিসংযম' করা যাইবে না এবং উহার অন্তর্নিহিত আবর্জ্জনা ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের অতীত হইবে। ফলতঃ সোশিয়ালিষ্ট্ দিগের আদর্শ-সমিতি পরিণামে ঐকান্তিক যথেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়নের আকর—সুতরাং দাসত্ব-প্রসূ—হওয়াই সুনিশ্চিত।

সংক্ষেপতঃ কথা এই যে, অপূর্ণ ও দুর্ব্বলতা-প্রবণ প্রকৃতির সমবায়ে পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজসংগঠন করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যের ভয়ানক ভ্রম। হার্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার প্রবন্ধে যে সকল বিষয় অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের সম্বন্ধে অবশ্য ঘোর বিতর্ক উত্থিত হইতে পারে। সকল কথার সমালোচনা করি এমত স্থান নাই, বিশেষতঃ হার্বার্ট্ স্পেন্সারের ন্যায় মহামনস্বী দার্শনিকের তর্ক-জাল ছেদন

করিতে অগ্রসর হওয়া কতকটা ধৃষ্টতাও বটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ভবিষ্য-দাসত্বের' প্রধানতঃ যে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একবারে নির্ম্মূল হইলেই যে সংসার সুখ-শান্তি-স্বাধীনতাময় হইবে আমরা এমত বিবেচনা করি না। স্পেন্সার নিজেও সেরূপ বিবেচনা করেন না। তাঁহার সমগ্র তর্ক-সমষ্টির মূল মানবপ্রকৃতির অপূর্ণতা। অপূর্ণতাসত্ত্বে মনুষ্যের সমাজ ও শাসন-প্রণালী 'পূর্ণত্ব'-লাভ করিয়া সুখ-শান্তির আধার হইতে পারে না। ভাল, তাহাই হইল। মনুষ্যপ্রকৃতি অপূর্ণ; অতএব মনুষ্য-সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু সমস্তই অপূর্ণ থাকা স্বাভাবিক। মনুষ্যের 'স্বাধীনতা' তাহার প্রকৃতির অন্তর্গত, অতএব তাহাও কিয়ৎ-পরিমাণে অপূর্ণাবস্থায় থাকা স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহা অস্বাভাবিক নহে। 'দাসত্ব' অস্বাভাবিক, অতএব 'স্বাধীনতার' কিয়দংশ ক্ষুণ্ণ থাকা দাসত্ব নহে।

স্বাধীনতা বা স্বানুবর্ত্তিতার আবশ্যকতা কি? সাংসারিক ও পারলৌকিক সুখ ব্যতীত, বোধ হয়, আর কিছুই নয়। পারলৌকিক মানিলাম না। সাংসারিক সুখই ধরিলাম। মানসিক সুখও অবশ্য সাংসারিক সুখের অন্তর্গত। স্বাধীনতাদ্বারা সুখ প্রাপ্তব্য, অতএব সুখ বাঞ্ছনীয়। পূর্ণ সুখ অসম্ভব; অপূর্ণ অবশ্য সম্ভব। কিন্তু সেই অপূর্ণ সুখের 'আদর্শ' কি? এই আদর্শ স্থির করা অবশ্য বিলক্ষণ কঠিন। তর্কের অনুরোধে নানা জনে নানা কথা বলিতে পারেন। নানা জনের নানা কথা সত্ত্বেও ইহা নিশ্চয় যে, সমাজমাত্র-বিচ্ছিন্ন শাসন-মাত্র-বিবর্জ্জিত এক জন বনবাসী মনুষ্য অপেক্ষা এক জন সামাজিক মনুষ্য অনেকাংশে সুখস্বাচ্ছন্দ্য-সম্পন্ন। কিন্তু বনবাসী মনুষ্য অনেকাংশে যেরূপ আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে, সামাজিক মনুষ্য সেরূপ পারে না। পারে না বলিয়াই কি তাহাকে দাসত্বপাশে বদ্ধ বলিতে হইবে? শব্দার্থের খাতিরে যদি বলিতেই হয় তাহা হইলেও সেই 'তথাভিহিত' দাসত্ব সুখের নামান্তর ও স্বাভাবিক; কেন না সুখস্বাচ্ছন্দ্য পায় বলিয়াই মনুষ্য স্বভাবতঃ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে; বন্ধনমাত্রবিহীন স্বাধীনতার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করে না, যে হেতু তাহা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায়। যাহা ন্যায়ানুগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় তাহা অস্বাভাবিক। দৈহিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির জন্য কতকগুলি নিয়মের অধীন হওয়া দাসত্ব নহে, প্রত্যুত তাহাকেই স্বাধীনতার সাম্যাবস্থা বলিতে হয়। তবে সকল বিষয়েরই সীমা থাকা আবশ্যক। নিয়ম-আইন-কানুন-বিধি-ব্যবস্থার সীমা থাকা চাই নতুবা বিপর্য্যয় ঘটে। স্পেন্সার, বোধ হয়, তজ্জন্যই 'ভাবিদাসত্বের' আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। যত দূর সম্ভব মনুষ্যের স্বানুবর্ত্তিতার সহিত সামঞ্জস্যসাধন করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। তবে অস্বাভাবিক স্বানুবর্ত্তিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতায় আঘাত লাগিবে বলিয়া 'ব্যবস্থামাত্রই' বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। পরন্তু সোশিয়ালিষ্টদিগের আদর্শ-শাসন প্রণালীর পরিণাম ব্যভিচার ও অত্যাচার হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি সাধারণ সমাজ বা সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে, সমবেত-কার্য্যমাত্রই পরিহার করিতে হইবে? মনুষ্য-প্রকৃতি দুর্ব্বল ও অপূর্ণ;

কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্রন্দনশীল দার্শনিকের ন্যায় বিবলে বসিয়া কেবল রোদন করিতে হইবে? দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য এক বিন্দু চেষ্টাও করা হইবে না? স্পেন্সার বলিবেন, চেষ্টা করিয়া কি করিবে? সে দুঃখ দূর হইবার নহে। দূর হইবার কি না তাহা জানি না, কিন্তু দূর করিবার জন্য 'মনুষ্যের মন' স্বতঃই ধাবিত হয়?। মনুষ্য অর্থ-ব্যবহারিক-সূত্র অপেক্ষা হৃদয়াবেগেরই অধিকতর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, হার্বার্ট্ নিজেও, বোধ হয়, তাহাই করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আর একটী মাত্র কথা। এইটীই বিশেষ আবশ্যকীয় কথা। আমাদের বিবেচনায় হার্বার্ট্ স্পেন্সারের এই সারগর্ভ প্রবন্ধটীর বিষয় শিক্ষিত ভারতবাসিমাত্রেরই অলোচ্য ও বিবেচ্য হওয়া উচিত। হার্বার্টের অনেক কথা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষরূপ প্রযুজ্য। ভারতবাসীর চিরদাসত্ব ত আছেই আছে। কিন্তু অধুনা আইনকানুনের আতিশয্যে সেই দাসত্বের ভার, অন্যবিধ দাসত্বের সহিত সংযোজিত হইয়া, ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে, অথচ ভারতবাসী তাহা বুঝিতেছেন না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাঁহার আইনতৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। আইনের পর আইন চাহিতেছেন। আইন হইলেই যেন সকল দুঃখ নিবারিত হইবে। 'প্রজাবৎসল' গবর্ণমেণ্টেরও ত্রুটি নাই, 'আইনের পর 'আইন দিয়া' ভারত বাসীকে হাতে গলায় বাঁধিতেছেন। সে আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে,—বলিতেছে 'আমার মুখে ভাত তুলিয়া দিয়াছ, কিন্তু গিলিতে পারিতেছি না, একটা আইন করিয়া গিলাইয়া দাও'। উঃ! কি বিসদৃশ দৃশ্য! ভারতবাসী এখনও সাবধান হইবেন না?

হার্বার্ট্ ইয়ুরোপে ভবিষ্যতে যে দাসত্বের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিনতর দাসত্বের ভার ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে সহ্য করিতেছে। তবে সময়ে না কি সকলই সহিয়া যায়, এই রক্ষা! নতুবা গুরুভারে ভারত এত দিন নিশ্চয়ই ভূগর্ভে প্রবেশ করিত।

জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিলাতে নিষ্কর্ম্মা গরিবদুঃখিদিগের ভরণপোষণ করা হয়, দেখিয়া হার্বার্টের সুতীক্ষ্ণ ন্যায়শীলতা স্তম্ভিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের ব্যবস্থা অন্যরূপ। এখানে গরিবের 'গা ঘামান' অর্থ ধনীর বিলাসের জন্য ব্যয়িত হয়। এখানে সঙ্গতিশালী খৃষ্টান ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া 'পারলৌকিক উন্নতি' লাভ করিবেন, অতএব হিন্দুমুসলমান ট্যাক্স্ দেয়। এক আধ পয়সা নয়, বৎসরে বিংশতি লক্ষটাকা খৃষ্টান পুরোহিতদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভারতবাসিদিগকে অনাহারে থাকিয়াও সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইতে হয়!! এই রূপ অনেক প্রকারে ভারতের রক্ত শোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কাঁদিবার স্থান নাই,—কে শুনিবে? কাঁদিবার সাহস নাই—পাছে প্রভু কশাঘাত করেন! কাঁদিবার শক্তিও নাই,—অচল, নিষ্পন্দ!!!

ঃঃ দঃ

ভারত-শাসনে অর্থের অপচয়। (১)

এক দল লোক যখন তখন এই বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন যে ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষের বিলক্ষণ আর্থিক উন্নতি হইয়াছে; উহার সমৃদ্ধিশালিতা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এদিকে ভারতের একপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত সকলই 'হা অন্ন যো অন্ন, করিতেছে। ধনিদিগের মধ্যে অনেকেই নির্ধন হইয়া পড়িয়াছেন, মধ্যবিত্ত লোকদিগের শতকরা নব্বই ঘর অর্থাভাবে অবসন্ন; কৃষিজীবীর উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্রনাই। তারপর ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিজের অবস্থাও 'তথৈবচ', 'ডোলে গোক শামুকে ধান'। কোন একটা কাজ করিতে হইলে ঋণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যত তিনি পাবেন ঋণ করেন, আরসেই ঋণ পরিশোধ করিতে দুঃখী ভারত-সন্তান 'মুখের গ্রাস' হইতে বঞ্চিত হয়। এই ত ব্যাপার। কিন্তু এই 'হাহাকারের' ব্যাপারের মধ্যেও ভারতের 'আর্থিক উন্নতিবাদ' প্রচারিত হয়; সমৃদ্ধিশালিতার গান গীত হয়। এ রহস্য ভেদ করিবে কে? এ 'রহস্য-ভেদ' করিবার অধিকার অবশ্য তোমার আমার নাই কেন না তুমি আমি মূর্খ ভারত-বাসী,—রাজশাসন-বিজ্ঞানের গভীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, রাজনৈতিক অর্থ-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম 'মারপ্যাচ' বুঝিতে অপারগ। কথাটা সূক্ষ্মই বটে। যে অন্ন বিনা মারা পড়িতেছে, সেই আবার সমৃদ্ধিশালী ইহা বুঝিয়া উঠা স্থূলবুদ্ধির অতীত তাহাতে সন্দেহ কি?

যাঁহারা ভারতের সমৃদ্ধিশালিতা সমর্থন ও প্রচার করেন তাঁহাদিগের প্রায় কেহই 'কমলোক' নহেন। সকলেই এক এক জন ক্ষুদ্র মহাপুরুষ। মহাপুরুষ বলিয়াই ভারত-সাম্রাজ্য-শাসনার্থে ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হন। তাঁহারা 'হাতে কলমে' ভারত-শাসন করিয়া গিয়াছেন ও অনেকে এখনও করিতেছেন; অতএব ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবেন, সমস্তই গ্রাহ্য,—গ্রাহ্য ভিন্ন অগ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা এক দিকে যেমন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, অপর দিকে তেমনি 'ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ'। পাণ্ডিত্য

(১) 'The Spoilation of India,'—An article contributed by Messrs. J. Seymour Keay in the "Nineteenth Century' of July 1883 and April 1884.

ও 'অভিজ্ঞতা' একত্রে মিলিত হইয়া যে 'সিদ্ধান্তে' উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য হইলেও স্বীকার্য্য। ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষে সমৃদ্ধিশালিতা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাদ্বারা স্থিরীকৃত অতএব সকলকেই 'মানিয়া লইতে' হইবে।

'প্রাগুক্ত সমৃদ্ধিশালিতা-বাদ' সমর্থনাকারী মহাপুরুষদিগের, পাণ্ডিত্য ও ভারতবিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই,—সন্দেহের কারণাভাব। যাঁহারা সপ্তম্বে ভারতন্থ সুমার্জ্জিত ভাষায়, পরিষ্কার অর্থযুক্ত যুক্তি-তর্ক-সমন্বিত দশ পৌনেবটা করিয়া 'লম্বা চেওড়া' 'রিপোর্ট' ও 'মিনিট' লিখিয়া অপরিসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ও এখনও দিতেছেন, তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই অবশ্য মূর্খ বলিতে পারি না। তারপর যাঁহারা বহুবৎসরাবধি ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতসন্তানের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারত-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইহাই বা কি রূপে বলিতে পারি? ফলতঃ ভারতের 'তথাভিহিত' শ্রীবৃদ্ধিপ্রচারক মূর্খও নহেন ও ভারতের অবস্থাবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞও নহেন। কিন্তু তথাচ দেখিতেছি, তাঁহারা 'জল কে দুদ ও দুদ কে জল' বলিয়া পৃথিবীতে অসত্য প্রচার করিতেছেন। অথচ আমরা যত দূর জানি, তাঁহারা নিজে স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় লোক—অসত্যকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন। অসত্যকে ঘৃণা করিয়াও অসত্য প্রচার করেন ইহার, কারণ কি? বস্তুতই কি রাজনৈতিক ব্যাপারে সত্যাসত্য ধর্ত্তব্য নহে?

কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। যাঁহারা ভারতের সমৃদ্ধিশালিতার ঘোষণা করেন তাঁহাদিগের নিজের পক্ষে ভারত বস্তুতই সমৃদ্ধিশালিনী;—কেননা তাঁহাদের অযুতাধিক মাসিক বেতন ও তদুপযুক্ত পেন্সন 'হাজা শুকার' অতীত, ভারতসন্তানের অনাহার ও আর্ত্তনাদ সত্ত্বেও প্রাপ্তব্য।

এক সময়ে ভারতের সমৃদ্ধিশালিতা ছিল বটে, কিন্তু বহুকাল হইতে তাহা আর নাই। কেবল নাম আছে। অবশ্য 'দরিদ্র-দুর্নাম চেয়ে ধন-অপবাদ ভাল'। কিন্তু আজকাল এই অপবাদে ভারতের বিলক্ষণ হানি হইতেছে, ভারতসন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার হইতেছে না। অতএব উক্ত অপবাদের প্রতিবাদ হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদ করে কে? অসত্য-খণ্ডন করিয়া সত্যপ্রচার করিবার লোক কই? ভারত-সন্তান নিজে এখনও 'অশক্ত'। নিজের কায নিজে সম্পন্ন করিবার শক্তি ও সাহস এখনও সে সম্যকরূপ লাভ করিতে পারেনাই, আর পারিলেও 'উপস্থিত ক্ষেত্রে' তাহা অগ্রাহ্য ও অসিদ্ধ। বিশেষতঃ 'লড়াইটা সমানে সমানেই হয় ভাল। তুমি ভারতবাসী অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা ইংরাজের অসঙ্গত কথার প্রতিবাদ করিতে উঠিলে, ইংরাজ চক্ষু রাঙ্গাইয়া তোমাকে দুই 'ধমক' দিল অথবা অকস্মাৎ একটা 'রুল' জারি করিয়া বসিল; তুমি পলাইতে পথ পাইলে না। অতএব যাহারা চক্ষু রাঙ্গাইয়া চক্ষু-রাঙ্গানির জবাব দিতে পারে, রুল দেখিয়া 'পিচপাঁও' হয় না, এমন কতকগুলি লোক ভারতের স্বার্থ-সমর্থন করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এমন লোক দুই চারি জন দেখাও দিয়াছেন। ইংলণ্ড ভারতের প্রতি

যাহাতে ন্যায়বিচার করেন তজ্জন্য ইঁহারা সর্ব্বদাই সচেষ্টিত ;—নীচ-মনা লোকদিগের ভর্ৎসনা-গঞ্জনা-তামাসা-টিটকারী সহ্য করিয়াও ভারতের কল্যাণার্থে ইঁহারা অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। এই দলের প্রধান স্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রবার্ট নাইট্‌ অন্যতম। সম্প্রতি আর একজন সহৃদয় ব্যক্তি ভারতের স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমরা হায়দ্রাবাদস্থ মিঃ সেমুর কি সাহেব মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। বিগত কয়েক মাস মধ্যে ইঁহাকে অনেকেই বেশ চিনিয়াছেন, অতএব সবিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

আমরা ভারতবাসী, বিশেষতঃ 'বাঙ্গালা কাগজের' লেখক, অতএব 'ছোট মুখে বড় কথা' বলিতে চাহি না যে, ইংরাজ ভারতে তস্করতা করিতেছেন,—ভারতের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া কতক অপব্যয় ও কতক আত্মসাৎ করিতেছেন। ছোট মুখে এতবড় কথা আমরা বলিতে পারি না, বলিতে চাহি না। কিন্তু মিঃ কি 'জবরদস্ত' লোক 'চক্ষু-বাঙ্গানি' ফেরত দিতে সমর্থ, অতএব যাহা সত্য বলিয়া জানেন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত নহেন। তিনিই উপরোক্ত 'তস্করতা' ঘটিত কথা তুলিয়াছেন ও তাহা সতেজে সমর্থন করিয়া বিলাতের সর্ব্বপ্রধান মাসিকপত্র 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি'তে প্রবন্ধ লিখিতেছেন ইঁহার Spoliation of India 'ভারতার্থ-লুণ্ঠন' নামক প্রথম প্রস্তাব গত জুলাই সংখ্যা নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরীতে প্রকাশিত হয়। এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব উল্লিখিত পত্রের বিগত এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মিঃ 'কি'য়ের ভারত-লুণ্ঠন-বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রতিপাদিত হইয়াছে,—

১। ভারত-সম্রাজ্য তরবারিদ্বারা জয় করা হয় নাই, ভারতীয় রাজন্যগণের সহিত 'সন্ধি' ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ভারত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব।

(২) ভারত-শাসন-প্রণালীর বর্ত্তমান অবস্থা উহার প্রাথমিক ইতিবৃত্তেরই পরিচায়ক। উহা অদ্যাপি ভারতীয় প্রকৃতি ও ভারত সন্তানের স্বার্থের সহিত বিমিশ্রিত হইতে পারে নাই, -নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের পরিচিত পথেই অগ্রসর হইতেছে, ভারতীয় প্রজার প্রতি উহার কিঞ্চিন্মাত্রও সহানুভূতি নাই। ভারত-শাসন প্রণালী একদিকে যেমন ভারতীয় স্বার্থের অনুপযোগী, অপর দিকে তেমনি ভয়ানক ব্যয়সঙ্কুল। ভারতসন্তানদিগের প্রতি নানা প্রকার নিষ্ঠুর ও নির্ঘাত ব্যবহার করিয়া তাহাদিগের দ্বারাই উহার ব্যয়ভার বহন করান হয়, সুতরাং তাহারা দারিদ্র্য ও অনাহারের আশ্রয়স্থল হইয়াছে ও দিন দিন অবসাদে যাইতেছে। তাহাদের এই দুর্দ্দশা নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টকে এক দিন বিপদগ্রস্ত করিবে।

(৩) ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করা ইংলণ্ডের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কেননা ইংলণ্ড একদিকে নিজে যেমন ঋণগ্রস্ত হইতেছেন, অপর দিকে তেমনি প্রতিবৎসর ভারত শাসনের ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধন ঋণে জড়াইয়া পড়িতেছেন।

এই কথাগুলির অধিকাংশই সত্য হইলেও, বড় 'শক্ত' কথা। মিঃ কিয়ের ন্যায় বীরপুরুষ ভিন্ন অন্যে বলিতে সাহস করে না।

মিঃ কিয়ের প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পরেই ভারত-গবর্ণমেণ্টের দুইজন মহারথী উহার প্রতিবাদ করিবার জন্য আসর গ্রহণ করেন। মহারথিদ্বয়ের একজন নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। ইনি 'জন ইণ্ডিগো' বনামে 'ন্যাশন্যাল্ লিবিউ' নামক সাম্প্রদায়িক পত্রে গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিয়া কি সাহেবের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অপর মহারথী ভূতপূর্ব্ব-আফগানিস্তান-ব্যাপার-বিখ্যাত সার্ লেপেল গ্রিফিন। ইনি, গত অক্টোবর সংখ্যা 'ফর্টনাইটলী'তে, 'ভারতলুণ্ঠন' বিষয়ক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু প্রয়াস মাত্র, নিরবচ্ছিন্ন সত্য গোপন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। গ্রিফিন-মহোদয় 'ধান্য ভঙ্গ করিতে শীর-সঙ্গীতের' অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজগণ অতি অকাল কুষ্মাণ্ড, অতএব ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ভারতসন্তানের অর্থ অপচয় করেন না। কি অপূর্ব্ব যুক্তি। কিন্তু সে কথা যাক্। মিঃ কি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে প্রাগুক্ত সমালোচকদ্বয়ের কথারও সমালোচনা করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে 'মহারথি'যুগলকে 'উত্তম মধ্যম' প্রদান করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

মিঃ কি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় কথার বিচার করিয়াছেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইব, ভারত-শাসনে কি পরিমাণে টাকার শ্রাদ্ধ হয়।

ইংরাজ-শাসনে ভারতের ধনধান্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা উচ্চ চীৎকার করেন, তাঁহাদের একটী তর্ক এই যে, বিদেশীয় বণিকদিগের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি ধনবৃদ্ধির পরিচায়ক। ভারতবাসীর যদি ধন বৃদ্ধি না হইত তাহা হইলে কখনই ভারতের বহির্বাণিজ্যের এত বৃদ্ধি হইত না। ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে ৭,৭৫,০০,০০০ টাকা মাত্র মূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল কিন্তু ১৮৮২ সালে তথায় ৫০,০০,০০,০০০ টাকারও অধিক মূল্যের সামগ্রী আমদানি হয়; অতএব ১৮৩৫ সাল অপেক্ষা ১৮৮২ সালে ভারতের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতবাসী যদি যথার্থই গরিব হইয়া যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার ক্রয় করিবার শক্তি হ্রাস হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। তাহার ক্রয় করিবার শক্তি হ্রাস হইলে, কোটী কোটী টাকার বিদেশীয় বস্তুজাত ভারতে আমদানি হইয়া কিরূপে বিক্রীত হইতেছে? এই রূপ তর্ক উত্থিত করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রজার অর্থ-সচ্ছলতা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। "গবর্ণমেণ্টের খোলাভাটী 'বিভাগে' প্রচুর আয় হইতেছে, অতএব ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজাদিগের অবস্থা ভয়ানক সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। হাতে অধিক পয়সা না হইলে লোকে মদ কিনিতেছে কি দিয়া?"

বলা বাহুল্য যে, এ প্রকৃতির তর্ক 'বোকা বুঝাইতে' বেশ উপযোগী। কিন্তু উহা দ্বারা আসল কথা প্রমাণিত করা অসম্ভব। যাহা নাই—যাহার অস্তিত্বেরই অভাব—তাহা কি কখন তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে? তর্কের দ্বারা দরিদ্রকে ধনী করিয়া

দিতে পারিলে ত কোন ভাবনাই থাকিত না, কিন্তু তাহা পার কৈ?

প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে যত টাকার বিদেশীয় সামগ্রী আমদানি হয়, তাহার কিয়দংশমাত্র দেশীয় লোকদিগের দ্বারা ক্রীত ও ব্যবহৃত হয় আর সমস্তই অন্যবিধ কার্য্য ও অন্য লোকের সুখবিলাসে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমদানি-লব্ধ দ্রব্যজাতের প্রধান ও প্রথম অংশ ভারত প্রবাসী ইয়ুরোপীয়দিগের উপভোগের সামগ্রী, দ্বিতীয় অংশ রেলওয়ে ইত্যাদির 'লোহালক্কড় মালমশল্লা'।—এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রেলওয়ে কার্য্যে দেশীয় লোক ব্যবসাসূত্রে সংশ্লিষ্ট নয়, সুতরাং তাহাদের সহিত উহার লাভের সংস্রব নাই। কিন্তু লোকসানের ভাগ আছে। যাহা হউক আমদানি লব্ধদ্রব্যজাতের কথা কহিতেছি। উহার প্রথম দুই অংশের সহিত দেশীয় লোকের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। তৃতীয় বা অবশিষ্ট অংশ অবশ্য তাহারা ক্রয় করে বটে, কিন্তুকি জন্য? অতিরিক্ত সুখসম্ভোগ বা বিশেষ বিলাসের জন্য নহে। নিতান্ত যাহা না হইলে নয়—যাহা জীবন-ধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—তাহারই জন্য। একথা কুচক্রি শ্রেষ্ঠ স্বয়ং সার্ জন ষ্ট্র্যাচিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া১৮৭৮-৭৯ সালের বজেটে লিখিয়াছিলেন,—

"The people of India are too poor to consume many luxuries *The Import-trade Merely consists of either the materials of industry or the necessaries of life.*"

পরন্তু, আমদানি-লব্ধ বিদেশীয় দ্রব্য ভারতসন্তান যে পরিমাণে ক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নীত হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারে না। বিদেশীয় দ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক আমদানি হয়, অতএব লোকের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে একথা বলা অন্যায়। বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানিদ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, উহার ভয়ানক হ্রাসই হইতেছে। লোকের ক্রয়শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক হয় নাই। প্রত্যুত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশীয় দ্রব্যের অধিক আমদানি বিদেশীয় শিল্পী ও বণিকদিগের কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক, ভারতের ধনবৃদ্ধির পরিচায়ক নহে। ভারতসন্তান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক ব্যয় করিতেছেন তাহা নহে, তবে পার্থক্য এই যে, দেশজ দ্রব্যের স্থলে বিদেশীয় দ্রব্য অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালী বাবু অধুনা তামাকুর পরিবর্ত্তে ম্যানিলা সিগার ধরিয়াছেন, ঢাকাই মস্‌লিনের পরিবর্ত্তে 'বেলি গ্রেহ্যাম', পরিতেছেন। ভারত ললনার স্বর্ণালঙ্কার তৃষ্ণা কিঞ্চিৎ হ্রস্বাকৃত হইয়া না হয় গাউন বডি-স্পৃহা বলবতী করিতেছে। এই যাহা পার্থক্য। নতুবা লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি বা ধনাধিক্য হয় নাই। এতদুভয়ের হ্রাসই হইয়াছে। বিদেশীয় দ্রব্য দেশজ দ্রব্যের স্থান অধিকার করার পূর্ব্বে দেশের 'টাকাটা' দেশেই থাকিত, এখন দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং উহার উপসত্বে দেশীয় লোক বঞ্চিত ও বিদেশীয় লোক অধিকারী হইতেছেন। পরন্তু বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানিতে দেশীয় শিল্পি সম্প্রদায়ের একেবারে অন্ন মারা গিয়াছে। পরিশ্রমের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্য-অনাহারে

দেশের একটী প্রধান সম্প্রদায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও অচিরাৎ বিলুপ্ত হইবে। বিদেশীয় দ্রব্য আমদানি হইয়া ভারতের যে লাভ হইতেছে তাহা এই। তবুও কি না বিঘোষিত করা হয় যে, উহাই সমৃদ্ধিশালিতার লক্ষণ। মৃত্যুই জীবন!!!

অতঃপর ভারতের 'রপ্তানি কার্য্যের' কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। উহার আমদানি দ্রব্যের ন্যায় রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণও পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়াছে। রপ্তানিদ্রব্যাধিক্য ভারতীয় সমৃদ্ধিশালিতা প্রমাণ করিবার অন্যতম তর্ক। এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয়, তাহার অধিকাংশই কৃষি-জাত। 'কৃষি-জাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে, অতএব সমৃদ্ধিশালিতা-বাদ-সমর্থনকারিদিগের মতে, ভারতীয় ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া কৃষকদিগকে ধনশালী করিয়াছে।' কৃষকগণ আপনাদিগের ব্যবহারোপযোগী শস্য না রাখিয়া আর কিছু উহা বিক্রয় করে না। তাহারা ফেলিয়া-ছড়াইয়া খাইয়া, সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া, পরে যে শস্য উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই বিক্রয় করে অতএব তাহাদের আর দুঃখ কি? সুখই বাড়িয়াছে, শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে।'

আঃ ভগবন্! প্রার্থনা করি, ঐ কথাগুলিই সত্য হউক। কিন্তু হায়, ভারতীয় প্রজার নিতান্ত দুরদৃষ্ট! সে ফেলিয়া ছড়াইয়া খাইয়া, সঞ্চয় করিয়া তাহার পর বিক্রয় করে না। সে রক্ত জল করিয়া ক্ষেত্রে যাহা কিছু পায় সমস্তই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, মুখাগ্রগামী অন্ন-গ্রাসও বিক্রয় করে। নতুবা মহাজনের দেনা, জমিদারের খাজানা, পথকর, জলকর প্রভৃতি নানারূপ ট্যাক্স্-পরিশোধ হয় না,—মান-সম্ভ্রম-জাতি-কুল যায়—'ঝি বৌ' 'বেআব্রাক' 'বে-ইজ্জত' হয়,—নিজের পিটের চামড়া থাকে না। তার পর ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি একবিন্দুও বৃদ্ধি হয় নাই, বরং অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে কেননা ভূমিতে সার প্রদান করে, কৃষকের এমত সামর্থ্য নাই। আকবরের সময়ে যে পরিমাণ ভূমিতে ১১৪০ মণ গম জন্মিত, সেই পরিমাণ ভূমিতে এক্ষণে ৮৪০ মণও জন্মে না। ডাক্তার হণ্টার স্বয়ং এবথা তাঁহার 'England's Work in India, নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। স্বচক্ষে যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার আবার প্রমাণপ্রয়োগই-বা কি? ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কমিয়া গিয়াছে, শস্য অতি অল্পই জন্মে। কৃষক সমস্তই প্রায় বিক্রয় করে, বিক্রয় করিয়া ছয় মাস উপবাস, করে—আর ছয় মাস 'দেড়া বাড়িতে' ধার করিয়া খায়। যদি কৃষক প্রতিদিন দুই বেলা 'আধপেটা' করিয়াও আহার করে, তাহা হইলে রপ্তানি-শস্যের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ডাক্তার হণ্টার বলেন 'If all the poorer classes in India ate two full meals every day, the surplus for export would be much less than at present কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কৃষক যদি দুই বেলা 'ভোর-পেট' আহার করে, তাহা হইলে এক দানা শস্যও 'রপ্তানি' করিতে হয় না। ১৮৮০ সালে বিখ্যাতনামা মিঃ দাদাভাই নারোজী 'চক্ষে অঙ্গুলি' দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশে শস্য রপ্তানি হওয়া একবারেই অসম্ভব। কিন্তু তথাচ

যে হইতেছে ইহা কেবল ভারতের দুঃখেরই কারণ।

'আমদানি ও রপ্তানি'—উভয়ের কিছুতেই ভারতের ধনবৃদ্ধি হয় নাই, দৈন্যদশাই বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তবে বহির্বাণিজ্যে কি লাভ নাই? লাভ থাকিবে না কেন,—লাভ অবশ্যই আছে। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে সে লাভ হয় না। না হওয়ার কারণ ইংরাজ-শাসনের ব্যয়-বাহুল্য ও অর্থের অপচয়। মিঃ সেমুর দেখাইয়াছেন যে, যখন রপ্তানি-দ্রব্য অপেক্ষা অধিক মূল্যের আমদানি দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ যখন রপ্তানি দ্রব্যের 'পুরা মূল্য ও তদ্ভিন্ন তদুপযুক্ত লাভ পাওয়া যায়, তখনই বহির্বাণিজ্য সমৃদ্ধিশালিতার পরিচায়ক। ইংলণ্ড্ তাঁহার বহির্বাণিজ্যে—রপ্তানি-দ্রব্যে 'ওয়াজীব' মূল্য ও শতকরা ৩৩ পাউণ্ড লাভ পাইয়া থাকেন; ফ্রান্স ২২, সমগ্র ইয়ুরোপ গড়ে ১৯,—এমন কি তুরস্কও শতকরা ১৩ পাউণ্ড লাভ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভারতবর্ষের লাভের অঙ্ক কোথায় যায়? যায় তাহার শাসনকার্য্যে অপব্যয়িত হইবার জন্য—বিদেশীয় প্রভুদিগের উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য—অনর্থক ঋণের সুদ দিবার জন্য।

ঐ সকল 'বাবদে' ভারতের কত টাকা যায়? পাঠক শুনিলে চমকিত হইবেন। সার্ জন্ ষ্ট্রাচি নিজে বলেন, বাৎসরিক ১,৫০,০০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু মিঃ সেমুর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহার চতুর্গুণ। ছয় কোটী পাউণ্ডে কত কোটী টাকা হয়, পাঠক, একবার কল্পনা করুন। মিঃ সেমুর বলেন,—

"A figure, in fact, in presence of which the ocassional plunderings of former invaders sink into insignificance

'উহা এত টাকা যে, তাহার তুলনায় পূর্ব্ববর্ত্তী ভারত-আক্রমণকারীদিগের সাময়িক তস্করতা-লব্ধ ধনও অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে!।'

কিন্তু এই অর্থরাশি নিয়মিতরূপে, আইনেরদ্বারা, শক্তির পবিত্রনামে, ভারতবক্ষ হইতে প্রতিবৎসর ধীর-গম্ভীরভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। উহাকে তস্করতা কি রূপে বলিব?

তস্করতা না বলি, আর যাহাই বলি, উহার ফল হইতেছে—বড় বিষম। ভারত-সন্তান দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—অনাহারে। ইংলণ্ড্ কি একটীবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবেন না? ভারত-শাসনে কি তাঁহার কোনও দায়িত্ব নাই? ভারত রসাতলে যাইলে কি তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন না?

* * * * * * *

মিঃ সেমুর কি মহোদয়ের সমগ্র প্রবন্ধটীর সবিস্তার সমালোচনা হইল না। সাবকাশ মতে উহা পুনরায় অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

হাসির বিষাদ।

মরমের মাঝে মরমে মরিয়ে
কাঁদিস্ কেনরে প্রাণ ?
কি হেন বেদনা সহিয়ে হৃদয়ে
গাহিস্ কাঁদুনি গান ?
'বলি বলি করে তবু না বলিস,
ফোটা-ফোটা কথা ফোটে না ?
মরমের কথা মরমে মিশায়,
মুখ ফুটে, কেন ওঠে না।'

নধর অধরে বিষাদের বাস,
হাসি এসে ফিরে যায়,
হাসিরে কাঁদিতে দেখিনি কখনো,
আজ কেঁদে কেঁদে চায়।

সুখের সাগরে প্রেমের সুধায়
হাসি যে জাগিয়ে ছিল,
অধর দেখিয়ে বুঝে'ছিনু আমি,
(আজ) সে হাসি কাঁদিয়ে গেল।

হাসি।
কেন রে কাঁদিয়ে গেলি ?
(আমার) প্রাণকে কাঁদায়ে, আপনি কাঁদিয়ে,
বুকে কেন ব্যাথা দিলি।
যদিই দিলি রে ব্যাথা,
(তবে) ভাল ক'রে দে, নে রে ছিঁড়ে নে
চেতনা মরম-গাঁথা।

চেতনে চেতনে সহিতে পরিনে
মরমের ব্যথা আর,
অচেতনে রেখে, যা' রে তুই দেখে
আমার বেদনা-ভার।
জড়-প্রকৃতির জড়তার ছায়া
আমার এ কায়া ক্ষীণ,
জড় প্রকৃতির জড়তার ব্যথা
স'তে পারে নিশিদিন।

(কিন্তু) চেতনা তা'নয়, চেতনা আমার
জড়প্রকৃতির পর ;
দূর দেশ হ'তে পথ ভুলে এসে
এ দেহে বেঁধেছে ঘর।
(আহা।) জানে না চেতনা, কত যে যাতনা
এ ঘরে পাইতে হয় ;
পথ ভুলে এসে, এই হ'ল শেষে—
কেবল যাতনা সয় !

(আহা !) প্রাণের কাঁদুনি তাই,
(আহা !) হাসির কাঁদুনি তাই,
সহিতে না পারি' চেতনা আমার
চেতনায় যেন নাই।
সহে না যাতনা আর !
দুখিনী চেতনা এ ঘর ছাড়িয়ে
যা রে দেশে আপনার।

প্রাণটিরে মোর　　সাথে নিয়ে যা,
যাস্‌নি এ ঘরে রেখে,
প্রাণের আমার　　মুখ-ভরা হাসি
কোথা গেছে, নিগে দেখে।

(আহা।) হয় তো প্রাণের হাসি
জড়-প্রকৃতির　　দারুণ পীড়নে,
কোথায় গিয়াছে ভাসি'।
প্রাণের সে হাসি—সরলা বালিকা,—
জানে না সাঁতার দিতে,
অকূল পাথারে　　ডুবে গেল বুঝি
আকুলি বিকুলি চিতে।
অথবা সে হাসি　　কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ভ্রমে পথহারা হ'য়ে,
জড় প্রকৃতির　　কেউ তো তাহার
ব্যথে না ভরসা দিয়ে।

(আহা।) হয় তো সে রুচি হাসি
ফুলের নিকটে　　গিয়েছিল ছুটে
নয়ন সলিলে ভাসি'।
ফোটা-ফুল-মুখ　　কোমল ভাবিয়ে,
প্রাণের হাসিটি মোর
ব'সেছিল তায়,—　　কীটের জ্বালায়
পেয়েছে বেদনা ঘোর।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,　　আবার লুটিয়ে,
উলটি-পালটি খেয়ে,
চাঁদের নিকটে　　গিয়েছিল ছুটে,
বিষাদের গান গেয়ে।
পূরণিমা নিশি,　　ঝকে দশদিশি
চাঁদের কিরণ-ছাঁদে;—
হাসি যেই গেল,　　অমনি গ্রাসিল
নিরমম রাহু চাঁদে!

(ছি ছি।) বিক জড়-প্রকৃতিরে!
প্রাণের হাসিটি　　করে লুটিপুটি;
তবু না চাহিল ফিরে।

চেতনা গো। তাই বলি—
হাসিহারা প্রাণে　　এই বেলা নিয়ে
যেথা হ'তে যা'গো চলি'।
আমার মাথার দিব্যি,
ছেড়ে যা, ছেড়ে যা, এ দুখের ঘর;
চাস্‌নি চাসনি ফিরে।
প্রাণটিকে নিয়ে　　চ'লে গেলি তুই,
জড়-প্রকৃতি সে আর
কি মোর করিবে? কি বা ব্যথা দিবে?
সে বাঁধিবে তা'র ধার?

পঞ্চভূতময়　　এ দুখের ঘর
জড়প্রকৃতিরি খাঁচা,
প্রাণটিকে মোর　　নিয়ে গেলে তুই,
এ ঘর হইবে ফাঁকা।
তো দু'টির তরে,　　এ জড়ের ঘরে,
জড়সড় হ'য়ে আছি,
তোরা চ'লে গেলে,　　আমিও পালিয়ে
যাতনার দায়ে বাঁচি।
প্রাণের মায়ায়,—তোমার মায়ায়—
প্রকৃতির জ্বালা সই।
হাসি হারা প্রাণে　　প্রকৃতি কাঁদায়,
(এবে) প্রকৃতির আর নই।
চল গো চেতনা চল,
প্রাণটিকে ধর,　　আমাকেও ধর,
ফেলে যাই আঁখি-জল!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

সার-সংগ্রহ।

মাসিক পত্র।

বান্ধব ;—বৈশাখ, সন১২৯১ ; ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

১২৮৯ সালের চৈত্রমাসের সংখ্যার ৭ম খণ্ড সমাপ্ত করিয়া এক বৎসর অবসরের পরে ১২৯১ সালের বৈশাখ হইতে ৮ম খণ্ড আরম্ভ করা হইয়াছে। এক বৎসর কাল সময়ের পশ্চাতে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা অবলম্বিত উপায় সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের অনাদর কত দিনে তিরোহিত হইবে? যদি গ্রাহকগণের উৎসাহ-শিথিলতায় বান্ধব বা বঙ্গদর্শন কাল-কবলিত হয় তাহা হইলে কি বাস্তবিকই আমরা বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক নহি? যে সকল কারণে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের উপস্থিত দুর্দ্দশা, অর্থাভাবই তাহার সর্ব্বপ্রধান। আর আমরা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে জানি না বলিয়া উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্র ফেলিয়া অতি হেয় ইংরাজি কাগজের গ্রাহক হই,—এবং প্রতারিত হইয়াও বিরত হই না। বৃদ্ধা মাতা অন্নাভাবে শীর্ণা, কিন্তু আমরা এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, "গোমেশ" সাহেবের মেম্ বিলাত (চট্টগ্রাম!) হইতে আসিবেন বলিয়া প্রকাণ্ড এক "ডিনারের" বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়া আছি। মাতৃভাষার আলোচনার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয়কে দাতব্য বলিতে চাও বল। কিন্তু Charity begins at home, অতএব দাতব্যটা গৃহ হইতেই আরম্ভ হউক না কেন? বান্ধব কৃতবিদ্যদিগের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা যে কথাটা ইংরাজী বলিয়াও যেন তাঁহারা কর্ণে স্থান দেন। "বান্ধব" আমাদিগের প্রকৃতই বান্ধব—অর্থের জন্য যেন বান্ধবের কোন ক্ষতি না হয়! সম্পাদনে কিছু শৈথিল্য আছে কি না নিশ্চিত জানি না, কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর যে শক্তির ঋণ হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস হয় না। এ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছেঃ—

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম—চতুর্থ দিন।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৩। দুর্গাদাস।

৪। অগ্নিকুল—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৫। হিন্দুদিগের অবনতি—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৬। এক্সচেঞ্জ্।

১। "কি উদ্দেশ্যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জাতিভেদ হইতে কি ফল সমুদ্ভূত হইতেছে," এ প্রসঙ্গে তাহাই, স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ মতের সহিত, আলোচিত

হইয়াছে। "কৃষ্ণ বলিলেন—আমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা প্রবর্ত্তিত করি নাই। *** তবে আমি হিন্দুসমাজে অথবা হিন্দুদের মধ্যে যে শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম, সেই শক্তি প্রভাবেই কালসহকারে সমাজমধ্যে চারিটী বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি জাতিভেদের কর্ত্তা নহি বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে আমিই এই শ্রেণিবিভাগের কর্ত্তা"। যাঁহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ভারতে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাঁহারা ভ্রান্ত। কোন একটী জাতিকে এক দিনে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, স্পেন্সার হইতে এ বিষয়ের মীমাংসা উদ্ধৃত হইয়াছে। যে সকল স্বাভাবিক কারণে জাতিভেদ প্রচলিত হয় ইংলণ্ডেও তাহার অপ্রতুল নাই। সুতরাং ইংলণ্ডে যে শ্রেণিবিভাগ হইয়াছে ও হইতেছে, স্পেন্সার হইতে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। "কোন এক সমাজের আদ্যন্ত বিবেচনা করিলে তিনটী অবস্থা দেখিতে পাইবে। প্রথম বাল্যাবস্থা। এ অবস্থায় মনুষ্যে মনুষ্যে বড় প্রভেদ থাকে না, সকলেই একই প্রকার কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখে। দ্বিতীয় যৌবনাবস্থা। এই অবস্থায় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হইয়া, অর্থাৎ সমাজিস্থ ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীতে বা নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া সমাজের বলাধান ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে। তৃতীয় বৃদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় এক একটী করিয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত হয়। *** সমাজ তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যত দিন জাতিভেদ প্রবল থাকে, তত দিন সমাজের বিনাশ নাই। কিন্তু যখন শ্রেণিবিভাগ নষ্ট হয়, সকল মনুষ্য একই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে যায়, তখনই সমাজের উচ্ছেদদশা উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা 'একাকার' হওয়াকে এত ভয় করিতেন। যে দিন হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য না করিয়া সকলেই উকীল ডাক্তার ও বেতনভোগী ভৃত্য হইবার ইচ্ছা করিবে, সেই দিন জানিও হিন্দুসমাজের অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে। * * * হিন্দুসমাজে, অন্ততঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বোধ হয় সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতিভেদ সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের অবনতি হইল কেন? লেখক ইহার পরিষ্কার উত্তর দিবার প্রয়াস না পাইয়া বলিয়াছেন যে, "বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু অনিবার্য্য"। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, জাতিভেদ জন্য সুবিধা অসুবিধা চারি বর্ণেরই সমান এবং কেহ কাহার উপর কোন অত্যাচার করে নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই জাতিভেদের উচ্ছৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে। জাতিভেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে 'কৃষ্ণ বলিতেছেন,—মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক। সেই তিনটী গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। দয়া, স্নেহ, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য সত্ত্বগুণের ফল। আত্মোন্নতি, উচ্চাভিলাষ, সৎকীর্ত্তি, প্রশংসালিপ্সা, প্রভৃতি কার্য্য রজোগুণের ফল। পরদ্রোহ, পরাপকার, প্রভৃতিদ্বারা আত্মোন্নতি, হিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কার্য্য তমগুণের ফল। *** এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না"। ব্রাহ্মণ সত্ত্ব ও শূদ্র তমোগুণবিশিষ্ট, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

সত্ত্বরজঃ ও রজস্তমোগুণবিশিষ্ট। মনুষ্যের মধ্যে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকাতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যাঁহারা জাতিভেদকে সমাজের অনিষ্টকর বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে অবগত হইবেন যে, সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবশ্যক ও অনিবার্য্য - ইহার বিপক্ষেই মতনিষ্ট।

৬। অনেকেই অবগত আছেন যে ইংলণ্ডে কোন দ্রব্যের মূল্য পাঠাইতে হইলে, পূর্ব্বে যে স্থলে ১০ টাকা পাঠাইলে চলিত, এক্ষণে সে স্থলে প্রায় ১২ টাকা ৫০ আনা পাঠাইতে হয়। কি কারণে এক্ষণে অতিরিক্ত মূল্য পাঠাইতে হয়, ইহাতে ভারতের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, স্বর্ণবৌপ্যের কি প্রকার অবস্থা— এই সকল বিষয় সাধারণকে সহজ কথায় বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধটীর অবতারণা করা হইয়াছে। যে পাউণ্ডের মূল্য পূর্ব্বে ১০৲ ছিল, এক্ষণে তাহার মূল্য ১২৲৮৷৷ হইবার কারণ বৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হওয়া। ১৮৭১ সাল হইতে বৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং এই হ্রাসনিবন্ধন ১৮৭০।৭১ হইতে ২৮৮২।৮৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতের ২১,২৩,৭৭,৭০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। নিম্নলিখিত কারণে ভারতবর্ষে বৌপ্যের মূল্য কমিয়াছে—(১) যে সকল দেশ পূর্ব্বে বৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহার করিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বৌপ্যমুদ্রা ছাড়িয়া এক্ষণে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে, সুতরাং অনেক বৌপ্য অব্যবহার্য্য হইয়াছে। (২) বৌপ্যের নূতন খনি আবিষ্কৃত হওয়াতে বৌপ্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছে। (৩) "ক্রিমিয়া-সমর এবং আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহ সময়ে, রুশিয়া ও আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড যে সমস্ত পণ্য আমদানি করিত, তাহা ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করিয়াছে; সুতরাং তজ্জন্য ভারতবর্ষে বহু বৌপ্যের আমদানি হইয়াছে। বৌপ্যের আধিক্য হওয়াতে বৌপ্যের বাজার পড়িয়া গিয়াছে"। (৪) কানপুর-বিদ্রোহ, বঙ্গের দুর্ভিক্ষ এবং রেলওয়ের জন্য ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে অনেক বৌপ্য বর্জ্জ লওয়াতে বৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে। অতঃপর স্বর্ণ বৌপ্যের কি প্রকার পারস্পরিক মূল্য পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা দেখাইয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যে বৌপ্যের মূল্য স্বর্ণের $\frac{১}{১৫}$ ভাগ ছিল এক্ষণে তাহার মূল্য $\frac{১}{৩৫}$ ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্ণবৌপ্যের সম্বন্ধ এই প্রকার দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই এক্সচেঞ্জ্ অধিক হইয়াছে। লণ্ডনে এক আউন্স বৌপ্যের মূল্য এক্ষণে প্রায় ৫১$\frac{৪}{৮}$ পেন্স, সুতরাং ১৮৩ ৮৬ গ্রেণ বা একটী টাকাতে যত বৌপ্য থাকে (১৮০ গ্রেণ) এবং তাহা প্রস্তুত করিবার যে ব্যয় (৩.৮৬ গ্রেণ) তাহার মূল্য অবশ্যই ১ শিলিং ৭$\frac{৪}{৮}$ পেন্স হইবে। কি কি আকারে ইংলণ্ড হইতে ভারতে অর্থ আইসে তাহার বিবরণও পরিশেষে লিখিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের হুণ্ডী কি কারণে কখন অধিক কখন অল্প মূল্যে বিক্রীত হয় তাহারও আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এক্সচেঞ্জ্ সম্বন্ধে লেখক আরও অনেক কথা ক্রমে বলিবেন বলিয়াছেন। প্রবন্ধটী বেশ সহজ কথায় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কি উপায়ে এক্সচেঞ্জ নিবারণ করা যাইতে

পাবে তাহার আলোচনা করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

নব্যভারত;—বৈশাখ, সন১২৯১; ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

বিগত জ্যৈষ্ঠ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে ১২ সংখ্যায় প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়া নূতন বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইল। মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া সম্পাদক প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—সে প্রস্তাবের কি হইল? গত বৎসর কয়েকটী 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' প্রবন্ধের কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়া আর হয় নাই, সে গুলিও সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

উপস্থিত সংখ্যার বিষয়ঃ—

১। বিবর্ত্তনবাদ। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্, এ)।

২। মনের মানুষ। (শ্রীসদানন্দ তর্কচঞ্চু)।

৩। নাস্তিকতা। (শ্রীসীতানাথ দত্ত

৪। অস্ত্র ও জয়। (শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)।

৫। দুর্গা। (ডাঃ শ্রীরামদাস সেন)।

৬। শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন।

৭। নব লীলা—উপন্যাস।

৮। অদৃষ্টবাদ ও কারণবাদ। শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

৯। গতবর্ষ—পদ্য। (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)।

১। বিবর্ত্তন বাদ। পৃথিবীতে এক কোটি জীবের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত জীব (১) কোটী বারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, কি (২) অবস্থাভেদে এক জীবের রূপান্তর হইয়া অন্য জীবের উৎপত্তি হইয়াছে? বিবর্ত্তবাদীরা দ্বিতীয় মতাবলম্বী, এবং দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতে অচেতন পদার্থের ক্রমবিবর্ত্তনে অচেতন পদার্থের এবং চেতনের বিবর্ত্তনে চেতন পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, অপরের মতে মূল সৃষ্টি অচেতন পদার্থ এবং সেই অচেতন পদার্থের বিবর্ত্তনে অচেতন ও চেতন—জগতের যাবতীয় পদার্থ—উৎপন্ন হইয়াছে। এ প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এক জাতীয় জীব ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হইয়া থাকে। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে স্থাপিত হইলেই জীব আপন পূর্ব্ব-প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। ক্রমে পূর্ব্ব প্রকৃতির হ্রাস হইয়া নূতন প্রকৃতির বৃদ্ধি হয় এবং শেষে নূতন অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব এক নূতন প্রকৃতি ধারণ করে। এই প্রকারে এক জাতীয় জীব ক্রমে কালসহকারে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। এই অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গিত শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থাপরিবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই এবং এক জাতীয় জীবের জাত্যন্তর-প্রাপ্তি চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অনেকগুলি উদাহরণদ্বারা জীবের জাত্যন্তরপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে,—সূত্রবৎ. কীট হইতে মশক, বোলতা ও ভিমরুলের উৎপত্তি; বেঙ্গাচি হইতে ভেকের জন্ম, পশুজাতীয় জীব হইতে তিমি মৎস্যের নূতন কলেবর

ও প্রকৃতিপ্রাপ্তি, বানর হইতে মনুষ্যের আবির্ভাব ইত্যাদি।

৩। নাস্তিকতা। সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। এই কারণ সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং ইন্দ্রিয়-পরীক্ষাদ্বারা জানা যায় যে, এই জগৎ পূর্ব্বাপরসংঘটিত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সমষ্টি মাত্র। কারণ—কি? যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ। যখন কার্য্যমাত্রই ইন্দ্রিয়বোধ্য, তখন আর ইন্দ্রিয়াতীত জড়শক্তি বা ঈশ্বরের কল্পনায় প্রয়োজন কি? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, জগতের আদি-কারণ কি? জগৎকে অনাদি বলিয়া মন পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়া নাস্তিকমায়াবাদ বলে যে, যদি একটী আদি কারণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কোন কার্য্যবিশেষকেই কেন কারণশূন্য বলিয়া কল্পনা করা যাক্ না? এ প্রকার কারণশূন্য কার্য্য কল্পনা করিলে ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা নাস্তিকতার মীমাংসা। আস্তিকতার মীমাংসা অতঃপর প্রদর্শিত হইবে। প্রবন্ধটী "পাশ্চাত্য মায়াবাদ" বিষয়ক প্রস্তাবের শাখামাত্র।

৪। অস্ত্র ও জয়। "প্রকৃত বিজয়-শীল পুরুষ লৌহ-অস্ত্রে জয়লাভ করেন না, নরকণ্ঠ, নরহত্যা—অত্যাচারের পূর্ব্বগামী দূতমাত্র, প্রকৃত বিজয়—আত্মার উপর আত্মার আধিপত্য,—হৃদয়ের উপর হৃদয়ের আধিপত্য,—কেবল মাত্র দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, প্রেম, উদারতা, ত্যাগস্বীকার এবং ভালবাসার দ্বারাই স্থাপিত হইয়া থাকে; এ স্বর্গের পুষ্প নরকের সারে কখনও বর্দ্ধিত হয় না।" তরবারির দ্বারা যে জয়লাভ করা যায়, তাহা স্থায়ী হয় না; ইহা প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ পাপের দ্বারা অর্জ্জিত ধন স্থায়ী হয় না। ইংরাজ কামানের বলে ভারত জয় করে নাই; যখন তাহারা ভারত জয় করে তখন তাহাদিগের চরিত্র এখনকার মত ছিল না। এখনকার মত থাকিলে ভারত জয় সহজ হইত না। সিপাহীযুদ্ধ ভারতের মঙ্গলপ্রদ হইল না, কারণ, মূলে অত্যাচার ছিল এবং চতুর ইংরাজ তৎকালে আবার সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল। ভারতে এক্ষণে যে সকল ইংরাজ, দেশীয়-রাজা, জমিদার ও প্রজা শ্রেণী আছে, তাহাদিগের পরস্পর সদ্ভাব নাই এবং, কাহার কি অধিকার কেহ তাহা ভাল বুঝে না বলিয়া দেশের এমন দুরবস্থা। তাহার উপর ইংরাজের ন্যায়পরতার অভাব। ভারতীয়েরা সময়ে সময়ে ইংরাজের কার্য্যের প্রতিবাদ করে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের বল কোথায়? ইহার উত্তরে লেখক বলেন, ন্যায়ের ধ্বজা উত্থিত হইলে সেনার অভাব থাকে না, নতুবা "অসহায় নিগ্রোগণ কোন্ অস্ত্রে যুদ্ধ করিল? যীশুশিষ্য কোন্ অস্ত্রে য়িহুদী রাজ্যের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিল? * * * ভারতবাসী যখন নিজের অধিকার বুঝিতে পারিবেন, নিজের অধিকার রক্ষা করিতে পারিবেন, এবং দৃঢ়তা ও সত্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, তখন শত্রুর শিবিরেও তাঁহার মিত্রের অভাব থাকিবে না। ইংলণ্ড, তখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নিজের একার্দ্ধের সহিত অপরার্দ্ধ যুদ্ধ করিবে; তখন নিরস্ত্র ভারত সশস্ত্র ইংলণ্ডকে যে জয় করিবে, সে বিষয়ে আর আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যখন ভারতবাসী প্রকৃত স্বভাব পূরণ করিয়া এক জাতি হইবে, তখন যে বল সৃজিত হইবে, তাহা

আর কাহার নিকট পরাস্ত হইবে না। এই প্রকারে গঠিত জাতীয় বলই প্রধান অস্ত্র। অবশেষে লেখক পরামর্শ দিয়াছেন যে, ভারতের যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে জাতীয় চরিত্র গঠনে যত্নবান হন। পরের দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আপন দুর্গ সংস্করণ আবশ্যক। আপন গৃহের ছিদ্র-সংস্কার না করিয়া পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনামাত্র। একতা কি তাহা ইংরাজ চরিত্রেই শিক্ষা করা যাইতে পারে। একতা সংস্থাপিত হইলে "ধর্ম্মো-ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" কথাটা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে না

মাস-সমালোচন।

গত মাস হইতে দেশের সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের রীতিমত আবির্ভাব হইয়াছে। এবৎসর রৌদ্রের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম, এবং অনেক স্থানে অল্প বা বিস্তর বৃষ্টিও পতিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়া তাদৃশ প্রশমিত নহে। কলিকাতায় এবং নিম্নবাঙ্গালার স্থানে স্থানে দিন কয়েক ভয়ানক 'ওলাউঠা' হইয়া গিয়াছে; বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, বসন্ত ও বিসূচিকা উভয়েরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত অনেক স্থানে বিসূচিকা পীড়ায় অনেক লোক মারা পড়িতেছে। এবৎসর বৃষ্টি কিরূপ হয় বলা যায় না, তবে আরম্ভটা নিতান্ত মন্দ নহে। বেহার প্রদেশে গত বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে তথাকার অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত অন্নকষ্ট ভোগ করিতেছে; তদুপরি এবৎসর যদি আবার অল্প বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

গ্রীষ্মারম্ভে রাজপুরুষদিগের শৈল-প্রস্থান,—সুতরাং রাজনৈতিক গগণ আজ-কাল অপেক্ষাকৃত সুস্থির। তবে ভারত-বাসী ইংরাজদিগের প্রধান মুখপাত্র ইংলিশ-ম্যান এবং পাওনিয়র একেবারে নিস্তব্ধ নহেন, মধ্যে মধ্যে দুই ধারে বাক্য পীযূষ বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। আমাদের জমিদার মহোদয়েরাও বড় নিশ্চিন্ত নহেন। বেণ্ট্ বিল্ টীকে অধঃপাতে না পাঠাইয়া তাঁহারা জল গ্রহণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা যে সর্ব্বতোভাবে ফলপ্রদ হইবে আমাদের এমত আশা নাই। ভারতবর্ষে সকলেই বলিয়াছে যে, প্রস্তাবিত আইনটী একেবারে নিষ্প্রয়োজন নহে, তবে, জমিদারদিগের কোন প্রকার অন্যায় ক্ষতি না হয়, এরূপ ভাবে ইহা বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, বিলাতের সাধারণ মতও

এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেথ্‌ব্রিজ্‌, বক্‌ল্যাণ্ড্‌, ডেকষ্টা প্রভৃতি জমিদারদিগের বিলাতস্থ উকীলগণ, আজ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ মেম্বরগণ সম্পূর্ণরূপে বিলের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হয়েন, কিন্তু তাহা হওয়া অসম্ভব। আমাদের বিবেচনায় জমিদারেরা 'জিদ' ছাড়িয়া কতকটা উদারতার সহিত কার্য্য করিলেই তাহাদিগের পক্ষে ভাল হইত। কেন না তাঁহাদিগের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও এক দিন না একদিন আইনটী বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তখন তাঁহাদিগের যে বেশী অপমান এবং প্রতিষ্ঠাচ্যুতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভারতসভা এবং সুরেন্দ্রবাবু গত মাসে অনেকটা প্রকৃত কার্য্য করিয়াছেন। এক মাত্র মাজিষ্ট্রেট কলেক্টরের হস্তে শাসন এবং বিচার উভয়বিধ কার্য্যেরই ভার অর্পিত থাকাতে অনেক সময়ে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর ইহা একটি মহৎ দোষ, এবং যত দিন পর্য্যন্ত এই দোষ না অপসৃত হইবে, ততদিন কিছুতেই সাধারণ প্রজাবর্গের মঙ্গল হইবে না। ভারতসভা এই অনর্থ নিবারণ করিবার জন্য মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, সাধারণের নিকট হইতে এবিষয়ে তাঁহারা কিরূপ সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রাপ্ত হন। দেশীয় সমস্ত সম্বাদপত্রই এই দরখাস্ত অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ দেশের জনসাধারণ ও অন্যান্য সভাসমিতি উৎসাহ এবং উদ্যম প্রদর্শন করিয়া এবিষয়ে আপনাদিগের একত্রীভূতমত গবর্ণমেণ্টের গোচর না করিবেন, ততক্ষণ সুফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কি?

ভারতসভা আরও দুইটী অতি শুভকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবু স্বয়ং আজকাল উত্তরপশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সে দুইটী অনুষ্ঠান—ন্যাশন্যাল ফণ্ড্‌ এবং বিলাতীয় সিবিল সার্ভিস। বোধ করি সকলেই অবগত আছেন, যে পূর্ব্বে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য পরীক্ষার্থিদিগের বয়ঃক্রম ২১ বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল, লর্ড্‌ সালিস্‌বরি যখন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্‌ সেক্রেটারি ছিলেন, তখন সেই বয়ঃক্রমের সীমা ২১ হইতে ১৯ নির্দ্ধারিত হয়। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে উক্ত সার্ভিস হইতে একবারে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়েই এই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। এই ভয়ানক অন্যায় এবং অবিচারের জন্য আমরা এপর্য্যন্ত বরাবরই অসন্তুষ্টিপ্রকাশ এবং আন্দোলন করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে বিংশতি কোটী ভারতবাসীর ক্রন্দন এবং কোলাহল কোন্‌ ছার পদার্থ? সুতরাং আমাদের সে ক্রন্দন এবং কোলাহলের কোন ফলই হয় নাই। সম্প্রতি বিলাতপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় কয়েক জন লোক একত্রিত হইয়া এসম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এক দরখাস্ত করেন। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দের সীপাহি-বিদ্রোহ-শান্তির পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন স্বনামে ভারতবর্ষের রাজত্ব গ্রহণ করেন, তখন সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গকে বুঝাইবার জন্য এক 'ইস্তাহার' প্রচার করা হয়। সেই ইস্তাহারে অপরাপর

অনেক কথার সঙ্গে এই কথাটীও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল যে, জাতি কিম্বা বর্ণভেদে কখন মহারাণীর কোন প্রজা সরকারী ছোট বড় কোন প্রকার কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। ভারতবর্ষীয় লোকেরা এই ইস্তাহারকে তাহাদিগের সত্ব ও স্বাধীনতার প্রধান সনন্দপত্র বলিয়া মান্য করিয়া থাকে, এবং শাসনকার্য্যে ইহার সঙ্গে কোন প্রভেদ ঘটিলেই, তাহারা সেই প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া দিতে চেষ্টা করে। বিলাতপ্রবাসী ভারতবর্ষীয়েরা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট যে কোন আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাও এই সনন্দ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যখন তদনুসারে সিভিল কিম্বা অপর কোন সার্ভিসেই প্রবেশ আমাদিগের জন্য নিষিদ্ধ নহে, তখন পরীক্ষার্থিদিগের বয়ঃক্রমের সীমা কমাইয়া দিয়া আমাদিগের সহিত এরূপ প্রবঞ্চনা করা কতদূর ন্যায়-বিরুদ্ধ। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি উক্ত আবেদনের স্পষ্ট উত্তর প্রদান করিয়াছেন 'যে, তিনি আপাততঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থিদিগের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছেন না! ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে জাতিকুল পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন এবং স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দেওয়া এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া যে ভারতবাসিদিগের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং সিভিল সার্ভিস হইতে একবারে তাহাদিগকে বঞ্চিত করাই যে এই নিয়মের অভিপ্রায় সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের সঙ্গে এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া কি আমাদিগের চুপ করিয়া থাকা উচিত? কখনই নহে। আমাদিগের এক্ষণে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, আমরা সমস্ত ভারতবাসী একত্রিত হইয়া, যে ভয়ানক অবিচার আমাদিগের উপর হইয়াছে তাহা স্বয়ং মহারাণী এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাকে জ্ঞাপন করি, এবং যাহাতে তাহা অচিরাৎ বিদূরিত হয়, তাহার চেষ্টা করি। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং সুরেন্দ্রবাবু তাহাই করিতেছেন। সুরেন্দ্রবাবু পাটনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে কাশী, প্রয়াগ, আলিগড, আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মুলতান, অমৃতসহর ইত্যাদি অনেকগুলি প্রধান সহর পরিদর্শন করিয়াছেন এবং এবং প্রত্যেক স্থানেই সভা আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক স্থানেই যেরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত কথাতে সাধারণে যেরূপ উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া যে আমরা কতদূর সুখী হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। এক্ষণে তাঁহার চেষ্টায় যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে অচিরাৎ একটী বলশালী সাধারণ মত সৃষ্ট হয়, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ ভবিতব্যক্রমে একই স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং উভয়ের মঙ্গলামঙ্গল এক্ষণে উভয়েরই উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা বিলক্ষণ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত মাসে ইংলণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। প্রথম মৈসরিক সমর। মিসর সমরের আজ পর্য্যন্ত 'বিংকর্ত্তব্য' স্থির হয় নাই। সেনাপতি

গর্ডন এখনও খার্টুমে অভিমন্যুর ন্যায় সপ্তরথিপরিবৃত হইয়া আছেন, এবং নব-উৎসাহে উৎসাহিত মাহাদি এখনও সৌদান-ভূমিতে বিজয়োল্লাসে কালাতিপাত করিতেছেন। ইংলণ্ড এই নাবকীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া ভাল কার্য্য করেন নাই। সৌদানের বিদ্রোহ শান্তি করা কার্য্যটী বড় সহজ নহে। অনেক কাল অত্যাচার এবং অরাজকতা সহ্য করিয়া তথাকার লোকেরা অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এবং "যতোধর্ম্ম-স্ততো জয়ঃ" এই মহাবাক্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি যে সহজে নির্ব্বাপিত হইবে এমন বোধ হয় না। এক দাম্ভিকতা এবং স্বার্থপরতাতেই ইংলণ্ডের বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ক্রমশঃ আরও হইবে। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, যদি খৃষ্টাব্দ ১৮৮২তে ইংলণ্ডের বণতরি গিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নগরী সমভূমি না করিত এবং তৎপরে ইংলণ্ডীয় সৈন্য গিয়া আরাবী পাশা এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উত্থানোন্মুখ স্বাধীনতাপ্রিয়তা বিধ্বংসিত না করিত, তাহা হইলে অদ্য ইংলণ্ডকে কিছুতেই এই নাবকীয় বিশৃঙ্খলায় জড়ীভূত হইয়া পড়িতে হইত না। ইজিপ্টের নিজ আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়, ইংলণ্ডের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা, সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ইহাতে রাজত্ব করিবার অভিপ্রায় তাহার কখনই নাই। এমন অবস্থায় যদি ইংরাজেরা দেশীয় শাসন-প্রণালী এবং দেশীয় সমাজপ্রণালী এতদুভয়কে সাব্যস্ত রাখিতেন, তাহা হইলে অতি সহজেই তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন নাই—ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়া এতদুভয়কেই বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে দেশ অধিকার করিয়া আপন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার নাই। সৌদান-বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত করিতে অনেক অর্থব্যয় এবং অনেক লোকক্ষয়ের প্রয়োজন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় তাঁহার পক্ষে যে তাহা অসম্ভব একথা আমরা বলি না, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হয়েন নাই; এখনও সন্দেহ ও অস্থিরমতিত্ব দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, এরূপ অর্দ্ধহৃদয়ে কার্য্য করিবার আর সময় নাই। হয় ইজিপ্ট একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ তাহা দখল করিয়া বসিতে হইবে। কাষ্ঠপুত্তলিকাস্বরূপ ক্ষেদিভ তিউফিক পাশাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিলে একটা রাজ্য কিছুতেই চলিতে পারে না। একথাও সত্য বটে যে, এই মিসরীয় ব্যাপারে ফরাসী, তুর্ক, ইতালীয়, এবং জর্ম্মন প্রভৃতি জাতিদিগেরও এরূপ ঘনিষ্ঠ সংস্রব, যে ইচ্ছা করিলেই ইংরাজেরা ইজিপ্ট অধিকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাতেও আমরা বলি যে, যদি বাস্তবিকই উপরোক্ত জাতিদের ঘনিষ্ঠতা এরূপ থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে অচিরাৎ একদিন সেই ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইতেই হইবে, উপায়ান্তর নাই।

ইজিপ্টের কথা ছাড়িয়াই রুষিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের আজকাল কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাই মনে উদিত হয়। গত মাসে এ সম্বন্ধেও দুই একটী নূতন কথা উপস্থিত হইয়াছে। রুষিয়ানেরা মার্ভ অধিকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই শুনা গিয়াছে; এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে, পারস্যরাজ্যের সীমোপবর্ত্তী সালাঙ্গ

নামক স্থানটীও নাকি তাঁহারা অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রুষিয়া এবারে অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে এতদূর আসিয়াছেন, যে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এতদূর আসিব বলিলেও ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁহাদিগের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এবারে এতদূর আসিলেও ইংলণ্ড তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন, বরঞ্চ শান্তি এবং সৌখ্যের প্রয়াসী। মধ্য-এসিয়ার কয়দিগের অগ্রগতিসম্বন্ধে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শান্ত রাজনীতি অবলোকন করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছি, এবং তাহাতে ইংলণ্ডেরই মঙ্গল এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। মধ্য এসিয়ার কয়রাজ্যের ক্রমবিস্তৃতি অপরিহার্য্য, এবং সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরনিয়ন্তৃত বলিয়াই বোধ হয়, যেন না বর্ত্তমান কালে যে সভ্যতা ইয়ুরোপখণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতই ক্রমশঃ অল্প অল্প সমস্ত পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িবে; এমন অবস্থায়, ইংলণ্ড যে রুষের অগ্রগতি নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, বেশ, তাহা লইয়াই থাকুন। যদি পূর্ব্ব হইতে মধ্য-এসিয়াতেও আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহাতে তাঁহাদের অধিকার স্থাপিত হওয়া সম্ভব হইত। কিন্তু তাহা কখন করেন নাই, এবং সে কার্য্য যখন সর্ব্বতোভাবেই রুষের হস্তে অর্পিত, তখন তজ্জন্য তাঁহার অস্থির হওয়া অনুচিত এবং বৃথা। বরং এমন অবস্থায় কেবলমাত্র মিত্রভাবে রুষের কার্য্য এবং অগ্রগতি সন্দর্শন করাই তাঁহার একান্ত শ্রেয়ঃ। অতএব এতকাল পরে, ইংলণ্ডের যে এই সুবুদ্ধি হইয়াছে, তাহা অতীব সুখের এবং মঙ্গলের বিষয়। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, আগামী বর্ষান্তে রুষিয়া এবং ইংলণ্ড উভয়ে একমত হইয়া একটী কমিশন নিযুক্ত করিবেন, সেই কমিশন স্বয়ং মধ্য এসিয়ায় উপস্থিত থাকিয়া কোন্ রাজত্বের সীমা ভবিষ্যতে কতদূর হইবে তাহা স্বীকৃত করিবেন। আমরা আশা করি, বিনা বিবাদ এবং বিসম্বাদে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

রুষ অগ্রসর হইয়া সীমোপরবর্ত্তী হইলে পাছে ভারতবর্ষের রাজত্বে কোন গোলযোগ-উপস্থিত হয়, ইহাই ইংলণ্ডের প্রধান ভয়। কিন্তু আমরা বলি, এজন্য লোকক্ষয় এবং বলক্ষয় করিয়া রুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে কোন ফলই হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বাহ্যিক বল যথেষ্ট আছে স্বীকার করি, এবং সে বলের দ্বারা একবার কিম্বা দুইবার রুষদিগকে তাঁহারা সংগ্রামে পরাভূত করিতে পারেন তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইলে কি তাঁহারা বিপদ হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন? কখনই নহে। আবার কিছুকাল পরে, যে বিপদ সেই বিপদই উপস্থিত হইবে। কিন্তু আবার ইতিমধ্যে যদি রুষেরা ভারতবর্ষের প্রজাদিগের রাজভক্তি কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারেন, (এবং তজ্জন্য যে তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা এবং নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিবেন তাহা অতি নিশ্চিত) তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপদ সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। সেই জন্য আমরা বলি, হিমালয়ের উত্তরাংশে রুষ যাহা করিবার করুন, ইংলণ্ডের সে দিকে তত দৃষ্টিপাত না করিয়া বরঞ্চ যাহাতে তাঁহাদের রাজত্বের

আভ্যন্তরিক বল সমধিক বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে যেই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই আভ্যন্তরিক বল কিসে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে? আমরা বলি, একমাত্র উদারতাপূর্ণ সুশাসনদ্বারাই তাহা হইতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক সদ্‌গুণ আছে স্বীকার করি, এবং সে সদ্‌গুণ যে প্রজাবর্গ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকে তাহাও ঠিক, কিন্তু এর বিষয় এই যে, সে সমস্ত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও এখনও ইংরাজের ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে অনেক অমার্জ্জনীয় দোষ বর্ত্তমান আছে। এখনও অনেক বিষয়ে তাহারা অন্ধকার, এবং এখনও অনেক বিষয়ে প্রজাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ। ইংরাজেরা সম্যক বুঝিয়া সময় থাকিতে এখন হইতে যদি সেই সমস্ত দোষ অপনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই ভাল; নচেৎ ভবিষ্যতে তাঁহাদের রাজত্বের ভাগ্যে যে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে? কিন্তু আমরা বলি, যদি একবার ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসীরা ইংরাজরাজত্বের উপর সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চিরকালের জন্য ইংলণ্ডের আধিপত্য যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন একা রুষ ছাড়িয়া সমগ্র ইয়ুরোপ একত্রিত হইলেও তাঁহাদের কেহই কিছু করিতে পারিবে না। হঃ মঃ।

নানা কথা।

দিবা দ্বিপ্রহরে, উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে, ইংরাজ-ভারতের প্রধান রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর উচ্চতম আদালতের উচ্চ প্রাসাদে দাঁড়াইয়া, একটা নরপ্রেত গুণ্ডা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য, কলিকাতা-পুলিষ-বেঞ্চের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট, মহামান্য হাইকোর্টের অগ্রগণ্য ব্যারিষ্টার, শিক্ষিত-মুষলমান-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক মাননীয় মিঃ আমির আলিকে, বিনাকারণে, বিনা উত্তেজনায়, যৎপরোনাস্তি অপমান করিল, উত্তম মধ্যম প্রহার দিল;—ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট অপরাধী গুণ্ডার দণ্ড করিলেন—প্রচলিত দশ রৌপ্যমুদ্রা!! মাননীয় মিঃ আমির আলির মানহানি করার শাস্তি হইল কোম্পানী সিক্কা নয়টাকা কয়েক আনামাত্র!!! মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে অনেক দেখিতে পায় ও অনেক শুনিতে পায়, আমরা দেখিতে পাইলাম ও শুনিতে পাইলাম, কেবল বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজী আইনের সূক্ষ্ম মর্ম্ম ও ইংরাজ প্রাড়্‌বিবাকের প্রগাঢ় বিচারশক্তি বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা বুঝেন, ব্যাখ্যা করুন। অথবা নিজে মিঃ আমির আলি,—তিনি ত স্বয়ং ব্যবস্থাপক,—ইংরাজ-নিয়োজিত 'আইন নির্ম্মাতা'—আমির আলি নিজে এ তত্ত্বের মীমাংসা করুন;—অজ্ঞলোকদিগকে বুঝা-

ইযা দিন,—আইনেব কোন্ অলক্ষ্য লক্ষণানুসাবে তাঁহাকে প্রহাব কবার দণ্ড দশ টাকা হয়। অনেকে বলিতেছেন,—এই গুণ্ডাঘটিত আমিবআলিব্যাপাবেব মূলে বিগতজীবন ইলবার্ট-বিলেব প্রেতাত্মাব ও উপস্থিত বেণ্ট্ বিলেব ভৌতিক দেহ নিহিত। ভগবান্ জানেন কিসে কি। তবে ঘটনাটা যে ঘটিযাছে, ইহাই কেবল আমবা জানি, এবং জিজ্ঞাসা করি,—অতঃপব কি ঘটিবে এবং কি না ঘটিবে?

আসল ইলবার্টবিলেব 'শ্রাদ্ধ-শান্তি সপিণ্ডকরণ' সমস্তই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও শুনিতে পাই যে, তাহাব 'মলমস্ব' ছাড়া হয় নাই,—ধবিযা থাকা হইযাছে। সূত্রেব কোন্ স্থানটা ধবা হইযাছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমবা দেখিতে পাই না, স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে পাই না,—উৎকৃষ্ট আই গ্লাস (Eye-glass) ও অণুবীক্ষণেব সাহায্যেও দেখিতে পাই না যে, সূত্রেব মূল কোথায় বা সূত্র কোথায়। যাঁহাবা 'সূত্র' ধবিয়া আছেন বা ধবিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাবা যদি আমাদিগকে একবাব সূত্রটা দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমবাও একটু ধবিতাম। আমরা যে 'সূত্র'টুকু ধবিয়াছিলাম তাহা অনেক দিন হইল বহু টানাটানিতে 'ছিঁড়ে কুটিকুটি' হইয়া পঞ্চভূতে লয় পাইয়াছে। কিন্তু অনেকের নিকট নাকি এখনও সূত্র আছে এবং তাঁহারা তাহা ধরিয়া রহিযাছেন। ধব ভাই, সাবধানে;—শক্ত করে—যেন 'ফোসকে' না যায়!

দেশীয ইংবাজী সহযোগী 'ইণ্ডিযান একো' উপরোক্ত 'সূত্রবাদেব' একজন প্রধান ও প্রচণ্ড 'পাণ্ডা', এবং সায়েদ আমিব আলি সাহেবেবও বিশেষ অন্তরঙ্গ বটেন। সাযেদ সাহেব কি সূত্রে প্রহার 'ভক্ষণ' করিলেন এবং কোন্ 'সূত্রে' প্রকাশ্য আদালতে সেই প্রহাব দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইল, সহযোগী তাঁহাব প্রচাবিত 'সূত্রবাদেব' আলোকে কিয়ৎপবিমাণেও ব্যাখ্যা কবিতে পাবেন না কি? 'প্রতিধ্বনি' বলিতে পাবেন, আমবা 'ধান ভানিতে শীবের গীত গাহিতেছি'। কিন্তু পাপ-সংসাবে 'ধান ভানিতে শীবেব গীতেব' প্রাযই আবশ্যক হয়,—কেন না, ব্যভিচাবী ভাবেব মধ্যেও সঞ্চাবী ভাব নিহিত থাকা অসম্ভাবিত নহে।

বিশ্ব-হিতৈষিনা-ব্রতাবলম্বিনী কুমারী সোবেন্স নাইটিঙ্গেল অস্মদ্দেশীয খাজানার আইনেব আন্দোলনোপলক্ষে বিলাতে প্রজাপক্ষ সমর্থন কবিতেছেন। কিছু দিন হইল ইনি 'জমী-জমা' সম্বন্ধে কযেকটী প্রশ্নেব যথাযথ উত্তর পাইবাব জন্য 'ইণ্ডিযান ভয়েস' নামক বোম্বাই 'পাক্ষিকে' একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি লক্ষ্য কবিযা হিন্দুপেট্রিযট, কুমাবী মহাশযার প্রতি একটু তীব্র কটাক্ষ কবিযাছেন। পেট্রিযট বলেন যে, 'কুমাবীর কথাগুলি কথাই নয়, নিতান্ত 'আনাড়ির' মত কথা। কথাগুলি যাহাই হউক, বিজ্ঞ ও প্রবীন পেট্রিয়টেব বিবেচনা কবা উচিত যে, তাঁহাব মত 'সবজান্তা' সকলেই হইবে এমত প্রত্যাশা কবা অন্যায়। বিশেষতঃ একজন বিদেশীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে বঙ্গদেশের কোন গ্রামে জমা জমীর কিরূপ বন্দোবস্ত, আদায়-উশুলের

কিরূপ নিয়ম ইহা জানা কখনই সম্ভবে না। কৃষ্ণদাসবাবু আজন্মকাল ঐ সকল ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও কি সকল বিষয় সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছেন? কমারী মহোদয়া প্রজা ও জমিদার উভয় পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন, অতএব জমিদার-পক্ষীয়দিগের কুণ্ঠিত হওয়ার কিছুই কারণ দেখি না।

মুন্সেফ্ আদালতে 'বসবাস' জমীর খাজনা 'আমানত' করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়, অথচ ছোট আদালতে উহা আমানত করিবার নিয়ম নাই, এ কারণ অত্যাচারী জমিদারদিগের প্রজাগণ প্রায়ই দুর্দ্দশাকে পতিত হয়। প্রস্তাবিত খাজনার আইনে 'বসবাস' জমীর খাজনা আমানতসম্বন্ধে একটী নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার জন্য 'গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, আইনের এই অঙ্গহীনতা দোষ এবার সংশোধিত হইবে।

আমাদের দেশে আজকাল কত সংবাদ পত্র হইতেছে, যাইতেছে,—উঠিতেছে, পড়িতেছে,—কত রকম রকমওয়ারি চালে চলিতেছে,—বাজা উজীর মারিতেছে,—নানা রঙে নানা ঢঙে ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' এরূপ দরের সম্বাদপত্র নহেন। ইঁহার চাল-চলন স্বতন্ত্র, রীতিনীতি আন্তরিক ও উচ্চ অঙ্গের। বয়ক্রম প্রায় ২৫ বৎসর হইতেছে,—এই দীর্ঘকাল স্বভাবে ও স্বধর্ম্মে থাকিয়া ইনি একই ব্রতে ব্রতী,-একই কার্য্যে নিযুক্ত;—সে ব্রত—সে কার্য্য পল্লিগ্রামবাসী দুঃখি-লোকদিগের দুঃখকাহিনী রাজদ্বারে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা। সহযোগীর আর্থিক অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক না হইলেও, স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে একদিনের জন্যও পশ্চাৎপদ নহেন। আলস্য-অবসাদ নাই, চাঞ্চল্য ও উন্মাদভাব নাই; গ্রামবার্ত্তায় যাহা কিছু সমস্তই কাযের কথা, ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য, চিন্তাশীলতা ও আন্তরিকতার সহিত লিখিত। কিন্তু এ বাজারে কাযের কথা শুনে কে? আন্তরিকতার আদর কোথায়? অনর্থক উচ্চ চীৎকার, ও অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কারেরই এক্ষণে 'পোয়াবার'। 'হাটের নেড়ে হুজুগ চায়'; গ্রামবার্ত্তায় হুজুক নাই,—কাযেই তাঁহার তাদৃশ আদর নাই। এই প্রাচীন ও বিজ্ঞ সহযোগী বড় আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আজকাল বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ, দেশের প্রকৃত অভাবের প্রতি দৃষ্টি করেন না, দেশের কোথায় কি হইতেছে তাহার অনুসন্ধান রাখেন না; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা ও আস্থা নাই, কেহ কাহারও কথায় কাণ দেন না, সকলেই স্ব স্ব 'লম্বাই চওড়াই' দেখাইতে অগ্রসর। গ্রামবার্ত্তার এই কথাগুলি সমস্তই ঠিক। সম্পাদকমহাশয়দিগের কিসের জন্য যে এত লম্বাই চওড়াই ও স্পর্দ্ধিতভাব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'যেন তেন প্রকারেণ' দুই জন গ্রাহক বাড়াইতে পারিলেই ইঁহাদের অনেকেই মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, অহঙ্কারে পথ দেখিতে পান না,—যেন কতই বাহাদুরী করিয়াছেন। এমত অবস্থায়ও বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যদি অধঃপাতে যাইতেছে না, তবে কোথায় যাইতেছে?

দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই চুরি-ডাকাতি-খুন-বাহাজানি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লোক সর্ব্বদাই শশব্যস্ত—উৎকণ্ঠিত;—রাত্রেও নিদ্রা নাই, জানে না কখন কি ঘটিবে। দস্যুগণ প্রকাশ্যে চিঠি লিখিয়া ডাকাতি করিতেছে,—রাজশাসনের আশঙ্কা করে না। ইংরাজের আমলে এরূপ দস্যুবৃত্তি বহুকাল হয় নাই। পুলিষ শান্তিরক্ষায় অসমর্থ,—অপরাধীর অনুসন্ধান করিতে অক্ষম। অশান্তি ও উৎকণ্ঠার রাজ্য দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। বঙ্গেশ্বর পীড়িত—রোগশয্যায় শায়িত,—তবুও সিংহাসন ছাড়িবেন না। এক্ষণকার রাজশাসন 'ডেস্প্যাচ' লিখনের নামান্তরমাত্র। সেক্রেটারী সম্প্রদায় 'ডেস্প্যাচ' লিখিতেছেন। কিন্তু এদিকে দেশ রসাতলে যায়।

মাসিক সহযোগিনী শ্রীমতী 'ভারতী' বিগত চৈত্র মাসের পর—কি কারণে জানি না—মৃত প্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদঘোষণা করিতেও কেহ কেহ ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা মৃত্যু ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা সহযোগিনীর ঘরের খবর রাখার সত্ত্বে সত্ত্বান, অতএব সংবাদটা বিশ্বাস না করিবারও বিশেষ কারণ ছিল না। যাহা হউক, দেখিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম যে, সহযোগিনী নশ্বর ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া 'দেবযানে' গমন করেন নাই; নবীন বেশে পুনরায় সাধারণ্যে দেখা দিয়াছেন। তবে এবার 'যাত্রা-পরিবর্ত্তন' করিয়া বাহির হইয়াছেন। ভ্রাতার কার্য্যের উত্তরাধিকারিণী ভগ্নী হইয়াছেন। 'ভারতীর' সম্পাদকীয় 'পদে' বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীদেবী সাহিত্যের হাটে নিতান্ত অপরিচিতা নহেন,—তিনি সুশিক্ষিতা ও সুলেখিকা,—আশা করি, তাঁহার সুকুমার লেখনী ও কমনীয় বিচারশক্তির প্রভাবে 'ভারতী' স্বকীয়া নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিবেন। বঙ্গসুন্দরীদিগের মধ্যে কুমারী স্বর্ণপ্রভা ইংরাজীসাহিত্যে প্রথম এম, এ, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী সাময়িক পত্রের প্রথমা 'সম্পাদিকা'। বঙ্গভূমে এই সকল ব্যাপার এই প্রথম হইলেও স্ত্রীজাতির আধুনিক উচ্চ শিক্ষার উত্তম পরিচায়ক।

একখানি সংবাদপত্রের মার্ফত খবর আসিয়াছে যে, 'সাধারণীর' অধিনায়ক 'বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাময়িক সাহিত্যের' সম্পাদকরূপে শীঘ্রই উদয় হইবেন। মাসিক পত্রের বাজার বড় 'মন্দা,' অতএব একজন 'মহারথী' আসরে না নামিলে আর কোন ক্রমেই চলিতেছে না, গোল থামান যাইতেছে না'। অক্ষয়বাবু শক্তিবান পুরুষ ও বঙ্গসাহিত্যের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহাতে কাহারই সন্দেহ নাই। তিনি যে কার্য্যেই হাত দিন, সুসম্পাদিত হইবে ইহাও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু মাসিক পত্রের 'মন্দা' হল কেন? যে 'বঙ্গদর্শন' হইতে বঙ্গ সমালোচনী মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি, তাহাকে অধঃপাতে পাঠাইয়া অন্যকে তাহার স্থানাভিসিক্ত দেখিতে আমাদের তাদৃশ রুচি হয় না। তবে বঙ্গদর্শনের আধুনিক 'আভ্যন্তরিক অবস্থা' আমরা সবিশেষ অবগত নহি। বারম্বার হস্ত পরিবর্ত্তনে ও অনুপযুক্ত হস্তে পড়িয়া, বঙ্গদর্শনের পুনর্জীবিত হওয়া ও পূর্ব্বভাব ধারণ করা

একান্তই অসম্ভব হইয়া থাকে, আর একখানি উন্নত অঙ্গের মাসিক পত্রের আবির্ভাব সুখেরই বিষয় হইবে। কিন্তু এসম্বন্ধে সাধারণীতে বা কোন বিশ্বাস্য স্থলে,—বিশেষ কোনও আভাস পাই নাই।

পাক্ষিক সমালোচকের দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম যে, বেহারের প্রধান নগর বাঁকিপুরে এশিয়াটিক সোসাইটির একটী শাখাসংস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। শুনিয়া সুখী হইলাম, গত ৩০ মে তারিখে পাটনার কমিশনর মিঃ হ্যালিডে মহোদয়ের ভবনে এসম্বন্ধে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। কিন্তু এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, ঠিক বুঝা গেল না। যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বাঙ্গালী ও বেহারিদিগের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব সঞ্চার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। বেহারস্থ বাঙ্গালিসম্প্রদায় বেহারপ্রবাসী অনেক ইংরাজের চক্ষুঃশূল, ইহা আমরা সম্যক অবগত আছি, তবে সাহিত্য-বিজ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্রেও যে শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইবেন ও সংকীর্ণতার পরিচয় দিবেন, এরূপ কখনই ভাবি নাই। সকলে একত্রিত হইয়া বন্ধুভাবে বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানান্বেষণ করা যে সোসাইটীর একই মাত্র উদ্দেশ্য, তাহাতে সম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব ও ব্যক্তিগত নীচতা প্রবেশ করিতে দেখিলে বস্তুতই হৃদয় বিদর্ণ হয়। এশিয়াটিক সোসাইটীর শাখা-সংস্থাপন-উদ্দেশে সে দিন বাঁকিপুরে যে সভা হয়, তাহা হইতে, ইচ্ছা করিয়াই, বাঙ্গালিদিগকে 'ছাঁটিয়া' ফেলা হইয়াছিল। বাঁকিপুরে তিনজন সব-জজ; দুইজন বাঙ্গালী, একজন বেহারী। বাঙ্গালী দুইজনকে বাদ দিয়া বেহারী জজকে সভার অনুষ্ঠাতা ইংরাজগণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বেহারী উকীলগণ সভায় আহূত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী উকীলদিগকে ডাকা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান-ক্রনিক্‌ল-সম্বাদপত্রের ম্যানেজার বাবু বিশ্বেশ্বর সিংহ অনুরুদ্ধ হইয়া সভায় যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু বেহার হেরাল্‌ডের সম্পাদক বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করা হয় নাই। বাঙ্গালীকে অবহেলা করিয়া বেহারীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এজন্য বাঙ্গালী কুণ্ঠিত নহেন, বরং বেহারীকে সম্মানিত করা হইয়াছিল এজন্য বাঙ্গালি-সন্তুষ্ট, কিন্তু বাঙ্গালিবেহারীর মধ্যে এরূপ অযথা পার্থক্য স্থাপন করায় ফল কি? বেহারিদিগের সহিত বেহারস্থ বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে যেরূপ ঘনিষ্টতা ছিল, এখন আর তদ্রূপ নাই। ইংরাজী শিক্ষার সম্প্রসারণে কোথায় তাঁহারা অধিকতর মিলিত হইবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া পরস্পরে অধিকতর বিচ্ছিন্ন হইতেছেন! আর সংকীর্ণমনা ইংরাজেরা নিজস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সেই বিচ্ছিন্নতা যাহাতে স্থায়িভাব ধারণ করে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালী ও বেহারী উভয়েরই এ বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। ইংরাজের সহিত 'হাত মিলান' পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা নহে!

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড] সন১২৯১সাল ; আষাঢ়, দ্বিতীয় পক্ষ। [দশম সংখ্যা।

মানব শ্রেষ্ঠ কেন ?

পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ—সমস্ত জীবের অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ কেন ? কিসের জন্য মানব শ্রেষ্ঠ ? দুই হস্ত ও দুই পদ আছে বলিয়া শ্রেষ্ঠ ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে বানর অপরাপর সকল জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। বলের জন্য যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ হইবে। সৌন্দর্য্য যদি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়, তবে ময়ূর, জিরাফ প্রভৃতি সুন্দর-দর্শন জীবগণ শ্রেষ্ঠ হইবে। শিল্পচাতুর্য্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইলে মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা, বীবর, ঊর্ণা-কীট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ হইবে। বুদ্ধি-কৌশল-প্রকাশে পরের অনিষ্ট করিতে পারার শক্তি থাকাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়, তবে কাক, শৃগাল প্রভৃতি জীবগণও অবশ্য শ্রেষ্ঠ হইবে। স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারাই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইলে, সকল পশুপক্ষীই শ্রেষ্ঠ হইত। স্বাধীনতা আছে বলিয়া বা সাম্যভাব বোধ আছে বলিয়া যদি মানব শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গেরা মানব হইতেও শ্রেষ্ঠ হইত। কেননা তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সমান। কোন প্রাণীই স্বজাতীয় অন্য কাহারও অধীন নহে। সমাজ, রাজা বা অন্য কেহ তাহাদের কার্য্যের বাধা প্রদান করে না। যাহার যাহা ইচ্ছা ও শক্তি, সে তাহা সম্পাদন করে। মানব নিয়ন্ত্রিত অন্য মানবের অধীন রহিয়াছে ; সুতরাং স্বাধীনতাদি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে—উপরোক্ত কোনটীই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। তবে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি ? বোধ হয় অনেকে, অথবা সকলেই, বলিবেন বুদ্ধিই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বুদ্ধি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কেন ? বুদ্ধির আবশ্যক কি ? যদি বলবৃদ্ধি করিবার জন্য, যদি স্বাধীনতা ও সাম্যলাভের জন্য, যদি স্বার্থপরতা সাধন করিবার জন্য, যদি সুরূপ ও সুবেশ করিবার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে সে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইবে কেন ? যাহা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে, বুদ্ধি যদি তাহাই সম্পন্ন করিল মাত্র, তবে বুদ্ধি কি প্রকারে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইবে ? পশুপক্ষ্যাদি যে সকল শক্তিসম্পন্ন বলিয়া ইতরপ্রাণীরূপে পরিগণিত হইয়াছে, বুদ্ধি যদি সেই সকল শক্তির উৎকর্ষ করিবার জন্য মাত্র আবশ্যক হইল, তবে সে বুদ্ধি মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বা মানবত্বের কারণ কি প্রকারে হইবে ? পশুপক্ষ্যাদির যাহা নাই, বুদ্ধি যদি তাহা সম্পন্ন না করিল, তবে বুদ্ধি মানবের কি বিশেষ প্রয়োজনে লাগিল ? কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বুদ্ধিকে কেবল ঐ সকল কার্য্যসাধনেই নিযুক্ত করিয়াছে। কিসে বলবৃদ্ধি হয়, কিসে

স্বেচ্ছাচারী হইতে পারা যায়, কি প্রকারে আপন উদর পূরণ ও ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ হয়, কি প্রকারে বেশবিন্যাস করিয়া বাবু সাজা যায়, কি প্রকারে কলে বলে কৌশলে পরের অনিষ্ট করিতে পারা যায়, পশ্চিম-ভূমিপ্রসূত সন্তানগণ কেবল তাহাতেই সকল বুদ্ধি ব্যয় করিতেছেন। তাঁহারা মানবগণের বিনাশসাধন জন্য লাঠি, তরবারিতে তুষ্ট না হইয়া, শতঘ্নী সৃষ্টি করিলেন। আবার তাহার উন্নতি করিয়া সহস্রঘ্নী প্রস্তুত করিলেন। ইচ্ছা এই যে, এক কামানে একবারে সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিব—কেহ যেন আমার প্রভুতা, সুখ, স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারের বাধা দিতে চেষ্টা না করে, করিলে সহস্রঘ্নী দ্বারা তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিব। স্ত্রীপুরুষগণ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া নানা প্রকার আমোদ ও ইন্দ্রিয়-সুখ (সময়ে সময়ে রিপুচরিতার্থ-সুখও বটে) সাধন করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা স্বাধীনতা, সাম্য ও নাস্তিকতা প্রভৃতির প্রচার; এবং নিত্য নূতন রকম বস্ত্র, শয্যা, যান, সুগন্ধদ্রব্য, পাউডার, পরচুলা প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সকলের মনোহরণ করিতেছেন। তাঁহারা পরের সমস্ত অপহরণ করিয়া লওয়ার অভিপ্রায় সাধন জন্য, কত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিদিন নূতন নূতন সহস্ররোগনাশক অমৃততুল্য ঔষধ আবিষ্কার হইতেছে, অতি মনোহর অতি আশ্চর্য্য থিয়েটার, সার্কস্, ম্যাজিক্ প্রভৃতি আমোদ প্রকাশ হইতেছে, অর্দ্ধেকমূল্যে ও বিনামূল্যে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় ও দান হইতেছে এবং দেশহিতের ভাণ করিয়া অজস্র বক্তৃতা, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। আরও আশ্চর্য্য ও লজ্জার কথা এই যে, তাঁহারা নিজে পুস্তক লিখিয়া নিজেই কবিবর বা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক প্রভৃতি বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া লোকের মনে ভ্রান্তবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কেহ কেহ নিতান্ত চক্ষুর্লজ্জার খাতিরে চাকরকে কার্য্যাধ্যক্ষ নামে পরিচয় দিয়া বিজ্ঞাপনে—তাহার উক্তিতে, নিজ কলমে—অমুক মহাকবি কি অমুক প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক প্রণীত অমুক পুস্তক কি অমুক পত্রিকা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বাক্য (ভট্টাচার্য্যের পত্র আড়াল) দ্বারা অর্থলুণ্ঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই প্রকারে নিয়ত নানা কৌশল, মিথ্যা কথা, জুয়াচুরী করিয়া সকলকে ভুলাইয়া সকলের অর্থ শোষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক আজি য়ুরোপ যাহা করিতেছেন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য পরানিষ্ট ও নিজের ইন্দ্রিয়সুখ সাধন। কেবল বুদ্ধি চালনার কৌশলেই তাঁহারা এত মিথ্যা বলিয়া, এত পরস্বাপহরণ করিয়া ও এত স্বার্থপর হইয়াও সকলের নিকট হইতে সুযশ লাভ করিতেছেন। উহাই কি মানবের বুদ্ধির প্রয়োজন? না ঐ সকলই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ? তাহাই ভাবিয়া কি বঙ্গীয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পাশ্চাত্য নরের মন্ত্র-শিষ্য হইতেছেন? বুদ্ধির কি এই প্রয়োজন? পশুত্ব-বৃদ্ধি করার জন্যই কি বুদ্ধির আবশ্যক? মাদকদ্রব্য সৃষ্টি ও ব্যবহার করিয়া বুদ্ধিনাশ করিবার জন্য কি বুদ্ধির প্রয়োজন? এবং সেই বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানব শ্রেষ্ঠ?

এ কথা যে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে কি বুদ্ধি মানবের অপ্রয়োজন? কখনই

না। বুদ্ধি মানবের নিতান্ত আবশ্যক এবং বুদ্ধিই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের ও মানবত্বের একমাত্র কারণ। কিন্তু বুদ্ধির কার্য্য উক্তরূপ নহে। অস্ত্রে হাত কাটে, বা অগ্নিতে গৃহ দগ্ধ হয় বলিয়া কখন বলিতে পার না যে অস্ত্র ও অগ্নির আবশ্যকতা নাই, উহারা অতি অপকারক পদার্থ। তুমি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া কখন তাহাদের দোষ হইতে পারে না। যরোপ বুদ্ধির ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়াই বুদ্ধির দোষ হইতেছে। ভারতীয় ঋষিরা উহার প্রকৃত ব্যবহার করিয়াছেন। ইতর প্রাণীতে কি নাই, যাহা নাই তাহা বুদ্ধি বলে মানব আবিষ্কার হইতে পারে কি না ও তাহা মানবে সংযুক্ত হইতে পারে কি না, যদি পারে তবেই মানব শ্রেষ্ঠ, নচেৎ মানব পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় অপর একটী জীবমাত্র—কৃমি, কীট, শৃগাল, সিংহ, হস্তী, প্রভৃতি যেরূপ পরস্পর ভিন্ন, মানব ও ইতর প্রাণী সেইরূপ ভিন্ন—ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মানবে এমন একটী শক্তি আছে যাহা অন্য কোনও প্রাণীতে নাই। সেই অপার্থিব শক্তিই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—সেই শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি হইলেই মানব জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিক সেই শক্তির বিকাশ ও পরিবর্দ্ধন করিয়া মানব যে সকলের শ্রেষ্ঠ ও দেবতুল্য হইতে পারে, তাহা তাঁহারা জ্বলন্ত অক্ষরে দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ইতর প্রাণীতে কি নাই ? তাহাদের ক্ষুধা আছে, সুখজ্ঞান আছে, মৃত্যুভয় আছে, স্বাধীনতা আছে, স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছসম্মিলন আছে, (স্ত্রীজীবের) সন্তান স্নেহ আছে। তবে নাই কি ?—একটী নাই। কি নাই ?—পরের সুখে আপনার সুখজ্ঞান—এবং তজ্জন্য আপনার দুঃখকে সুখজ্ঞান করিবার শক্তি পশুতে নাই। মানবে ঐ শক্তি আছে। মানব যদি ঐ শক্তির বিকাশ ও বর্দ্ধন করিতে পারে তবেই মানব শ্রেষ্ঠ, তবেই মানব মানব, তবেই মানব দেবতা। এই জন্য ঋষিগণ ব্রাহ্মণ হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ফলমূলাশী, জটাবল্কলধারী ও কঠোরব্রতাবলম্বী হইয়াছিলেন। এই জন্য শিবিরাজার আত্ম শরীর-দান, দধীচির অস্থিপ্রদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান প্রভৃতির এত প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্য 'অতিথিভিক্ষুকদিগকে অন্ন না দিয়া কেহ ভক্ষণ করিবে না,' "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ", 'নিষ্কাম ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম' প্রভৃতি অনুপম নীতির প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন,—এ জগৎ অনিত্য, আমাদের স্থিতির কিছুমাত্র নিয়ম নাই, আমরা এই আছি এই নাই, সহস্র চেষ্টা করিলেও আমরা আপন ইচ্ছা চরিতার্থ বা সুখ সম্পন্ন করিতে পারি না, প্রাণ প্রতিমা স্ত্রী ও প্রাণাধিক পুত্র ও নিজের আয়ত্ত নয়, তাহাদিগকে ভাল করিব মনে করিলেই ভাল করা যায় না, বাঁচাইয়া রাখিব ইচ্ছা করিলে বাঁচাইয়া রাখা যায় না, আপনি বহু চেষ্টা করিলেও জীবিত থাকিতে বা সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হই না অথচ ঈপ্সিতকার্য্য সম্পন্ন না হইলে আমাদিগকে দুঃখ পাইতে হয়—আবার না করিলেও ক্ষুধার যন্ত্রণা, রিপুর যন্ত্রণা এড়াইতে পারা যায় না, সন্তানসন্ততির কষ্টও নিবারিত হয় না। সুতরাং তাঁহারা

বুঝিয়াছিলেন - আমাতে স্বাধীন শক্তি বা ইচ্ছা কিছুই নাই, আমার সকল চেষ্টাই আমার অনায়ত্ত। আমি বিশ্বশক্তি সমুদ্রের অন্তর্গত একটী সামান্য বিন্দুমাত্র। সকল বিন্দু বা সকল আমিই আমার ন্যায়,—সেই সমবায় বিন্দু অথবা অনন্ত সাগরই আমাদের সমস্তের পূর্ণাবয়ব। এবং সেই পূর্ণাবয়বের কার্য্যই আমাদের কার্য্য। কিন্তু পূর্ণাবয়বের ধারণা করিতে, আমরা পারি না। কি করিলে পূর্ণাবয়বের কার্য্য করা হয় তাহাও আমরা বুঝি না—বুদ্ধির সে শক্তি নাই - সুতরাং বিচ্ছিন্নবলের বা বিশেষ কার্য্য করিয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত হইতে হইবে। তাহাই আমাদের সাধ্যায়ত্ত। আমাতে যে শক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করাই আমার কার্য্য,—* সুতরাং তাহাই আমাকে করিতে হইবে। তদ্দ্বারা আমারই কার্য্য হইবে বিবেচনা করা ভ্রান্তি ও পশুত্ব, সকলেরই বা বিশ্বের কার্য্য সম্পন্ন হইবে ভাবাই সার ও মনুষ্যত্ব। যাহাতে পরের দুঃখ নিবারণ হয় তাহা সম্পন্ন করাই আমাদের কার্য্য এবং তাহাতে তৃপ্তিলাভই আমাদের সুখ। আমরা যাহা করিব, তাহাতে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি বা পশু বৃত্তি চরিতার্থ না হউক, তদ্দ্বারা পরহিত হইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল এবং তাহা হইলেই আমার সমস্ত কার্য্য করা হইল। তাহাই আমার সুখ, তাহাই আমার কর্ত্তব্য এবং তাহাই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। কার্য্যসকল সফল হইল না বলিয়া দুঃখ করা আমাদের নিতান্ত অন্যায়। কেন না তাহা আমার শক্তির অতীত। যাহা আমি পারিব না তাহা পারিলাম না বলিয়া দুঃখ করা নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার কর্ম্ম। স্বার্থপর হইবার চেষ্টা করা মানবের—বুদ্ধিমান মানবের কর্ত্তব্য নহে। এ বিবেচনা ও সুখ মানবের আছে, ইতর প্রাণীর নাই। এই জন্য মানব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠপ্রাণী। এই জন্য ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, চৈতন্যের এত প্রশংসা, এই জন্য কোটী কোটী লোক তাঁহাদের চরণে প্রণত। কি জন্য বুদ্ধ প্রভৃতি এত উচ্চ হইলেন? বাহুবলে? না, চতুরতায়? তাঁহারা কি চুল ফিরাইতেন? না, ল্যাভেণ্ডর মাখিতেন? তাঁহারা কি আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলিয়া প্রচার করিতেন? না, পেটেণ্ট মেডিসিনের বিজ্ঞাপন দিতেন? তাঁহারা বড় বড় কামান ব্যবহার করিতেন? না, দেশের অর্থশোষণের চেষ্টা করিতেন?—অবশ্য ইহার কিছুই তাঁহারা করিতেন না। যাহা তাঁহারা করিতেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, আপন সুখ তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে সুখরূপে আলিঙ্গন করিতেন এবং পরের দুঃখ নিবারণ করিয়া তাহাদিগের সুখে সুখী হইতেন। যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইত, তাহাই তাঁহারা করিতেন। তাঁহারা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পরিবার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিষ্ট ও কর্কশবাক্য তুল্য জ্ঞান করিয়া প্রযোগকারীর সমান হিতসাধন করিতেন। এই জন্য তাঁহারা জগতে এত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইতর প্রাণীর মধ্যে নহে, মানবমণ্ডলী মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। অতএব মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ আর কিছুই নহে। সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করা, পর-

* মানবতত্ত্ব,—কর্ত্তব্যনিরূপণের উপায়—দেখ।

দুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী হওয়া এবং কামনাশূন্য হইয়া কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্য করিয়া মহাশক্তির শক্তি চরিতার্থ করাই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা আজি উহাকে মূর্খতা, কুসংস্কার, নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। উক্ত সভ্যতাভিমানীগণ পরকাল বা মহাশক্তিতে সমস্ত আরোপকে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া ইহকালের সুখের জন্য নিয়ত ব্যস্ত। তাঁহারা অতিথি ও ভিক্ষুকদিগকে বিরক্তকারী বলিয়া দণ্ড প্রদান করেন, বিনীত ও শান্তকে দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণা করেন। দয়াদ্রচিত্তকে Weakness বলেন এবং যে স্বার্থ হানি করিয়া পরের উপকার করে তাহাকে নির্ব্বোধ বলেন। বাঙ্গালি আজি তাঁহাদের শিষ্য—বাঙ্গালীও তাহাই শিখিতেছে। নাস্তিকদল আবার বড় জ্বালাইতেছে। তাহারা ঈশ্বর মানে না—মহাশক্তি মানে না। আপনাদিগকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানে স্বার্থপরতা সাধন করা তাহাদের মতে মানবের প্রধান উদ্দেশ্য। যে মহাশক্তি হইতে আমরা উঠিয়াছি ও যে মহাশক্তিতে আমরা লীন হইব, সেই মহাশক্তির বা ঈশ্বরের উদ্দেশেই যে আমাদের সমস্ত কার্য্য তাহা তাহারা মানে না। যে গুণ অর্থাৎ যে পরকীয় ভাবে মানব শ্রেষ্ঠ তাহা তাহাদের নাই। সুতরাং তাহাদিগকে মানব না বলিয়া পশু ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে ? নিঃস্বার্থ কার্য্য বা ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সম্বল। পরার্থচিন্তাই একমাত্র ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনেকে বলিতে পারেন,—পরার্থচিন্তাই যদি প্রকৃত ধর্ম্ম হয় তবে য়ুরোপীয়েরাই প্রকৃত ধার্ম্মিক, কেন না তাহারা যে কার্য্য করে তৎসমস্তই পরের হিতের জন্য। অর্থাৎ স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধনই তাহাদের মূলব্রত। আমরা প্রবন্ধান্তরে বুঝাইয়া দিব, তাহারা পরের উপকার বলিয়া যে কার্য্য করে, তৎসমস্তেরই মূল স্বার্থ সাধনা, প্রকৃত পরহিতব্রত কেবল ভারতীয় ব্রাহ্মণেরাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্য বলি,—বঙ্গীয় যুবকগণ, যদি ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে চাও, যদি মানব নাম সার্থক করিতে চাও, যদি দেবনামে অভিহিত হইতে চাও, তবে পাশ্চাত্য গুরু পরিত্যাগ কর, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ কর। নচেৎ তোমরা একটী 'কিম্ভূতকিমাকার' জীব হইবে—নর-সিংহ, বা নর শৃগাল হইবে অথবা নর দানব বা নর গর্দ্দভ হইবে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

দেবী চৌধুরাণী। (১)

বঙ্গদেশ বহুকালাবধি বিজাতীয় শাসনাধীন, পরাধীনতা পাশে বদ্ধ। বিজাতীয় শাসনে বিজাতীয় শিক্ষা অবশ্যম্ভাবী, বিজাতীয় শিক্ষার ফল জাতীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন। পরাধীনতার ফল পুরুষার্থক্ষয়। বঙ্গদেশবাসী এই দ্বিবিধ ফলেরই অধিকারী হইয়াছেন।

অধিকারই বটে। ঘৃণিতরও ঘৃণিত অধিকার। বাঙ্গালী উহা এক দিনে বা এক শতাব্দীতে প্রাপ্ত হন নাই। জাতীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন ও পুরুষার্থ ক্ষয় পরিব্যক্তক লক্ষণ এক দিনে বা এক শতাব্দীতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় না। গোপনে, অজ্ঞাতে, অলক্ষিতভাবে 'ভিতরে ভিতরে' কার্য্য চলিতে থাকে,—ক্ষয় কার্য্য, পরিবর্ত্তনক্রিয়া শনৈঃ শনৈঃ চলিতে থাকে,—সময়ে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তির সহিত প্রকাশ পায়।

জগতে সকল দ্রব্যই বিবর্ত্তনশীল। পরাধীনতা-জনিত উভয় অনর্থই কালকুক্ষিমধ্যে বিবর্ত্তনাধীন। প্রতাহ দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, বিন্দু বিন্দু করিয়া বিকাশ লাভ করে; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ, শতাব্দীর পর শতাব্দী বিগত;—আসিতেছে, যাইতেছে। সময় স্রোতের উপর ভাসিতে ভাসিতে বাঙ্গালীর দাসত্ব অনন্তের দিকে প্রধাবিত, ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে চলিতেছে,—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, আবেগ উচ্ছ্বাস বিবর্ত্তন বিকাশ আছে, বিশ্রাম নাই। সময়ের গতি অবিশ্রান্ত, বাঙ্গালীর দাসত্বের গতিও অবিশ্রান্ত। প্রথমোক্তের পরিবর্ত্তন আছে, শেষোক্তের পরিবর্ত্তন কোথায়? আবির্ভাব হইতে একই রূপ অবস্থাপন্ন। পরাধীনতার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার ফলের অবশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, প্রতিদিন হইতেছে;—পূর্ণতা হইতে অধিকতর পূর্ণতালাভ করিতেছে।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা যাহা ছিল, আজ তাহা নাই। কিন্তু তখন কি ছিল, আজ কি হইয়াছে? তখনকার অবস্থা হইতে এখনকার অবস্থা উন্নত নয় কি? তখন যেখানে অরণ্য ছিল, আজ তথায় সমৃদ্ধিশালিতার শত শত চিহ্ন বিদ্যমান। তখন দেশময় 'দাঙ্গা,' দস্যুবৃত্তি ও কুসংস্কার, আর এখন সর্ব্বত্র সুশাসন, শান্তি ও সংস্কারের কোলাহল,—বাণিজ্যের কলশব্দ। অতএব পূর্ব্বাপেক্ষা এখন শতগুণে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সন্দেহ কিছুই নাই। কিন্তু এ উন্নতি কাহার? এ উন্নতি ইংরাজশাসনের ও ইংরাজের। বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর নহে। এ উন্নতির মধ্যে বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্রও গৌরবের কারণ নাই।

(১)। দেবীচৌধুরাণী,—উপন্যাস। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বীণাযন্ত্র কলিকাতা, ১২৯১।

পূর্ব্বেও বাঙ্গালী অধঃপতিত ছিল, এখনও তা'ই আছে। তদপেক্ষা অধিকতর অধঃপতিত হইয়াছে, কেন না, সময় যে পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে, পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফলেরও সেই পরিমাণে পরিপক্কতা জন্মিতেছে। বিগত এক শতাব্দীর বিজাতীয় শিক্ষায় আর সেই শিক্ষার অস্বাভাবিক গতিশীলতায় বাঙ্গালীর জাতীয় স্বভাবের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালী নাই, ইংরাজও হইতে পারে নাই। তার পর বিজাতীয় শাসনের আত্যন্তিক কঠোরতায় বাঙ্গালীর বলবীর্য্যসাহস পুরুষার্থপোযোগী যাহা কিছু সমস্তই শিথিল ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজশাসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা প্রারম্ভে,—দাঙ্গা-ডাকাইতি, জুলুম জবরদস্তি, যথেচ্ছাচারের মধ্যে অনিয়ম, অমিতাচার, নিপীড়ন ও অশাসনের তাড়নায়, কুসংস্কারের কষাঘাতে, দেশব্যাপী অন্ধকারে, আলোকমাত্র-বিবর্জ্জিতাবস্থায়,—বাঙ্গালী যাহা ছিল, আজ সে তাহা নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর আলোকসত্ত্বেও, উন্নতির উচ্চচীৎকার বিধ্বনিত বঙ্গভূমি সাম্য ও সামাজিকতাবাদসমাকুল হইলেও বাঙ্গালী আজ বাঙ্গালীত্ব বিবর্জ্জিত। বাঙ্গালীর পূর্ব্বাবস্থা সম্যকরূপে ভাল ছিল বা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্যকরূপে মন্দ তাহা বলিতেছি না। তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা নাই ইহাই বলিতেছি। তিনি পিতৃভক্তির পরিবর্ত্তে বক্তৃতা দিতে, শীলতা ও শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে সংবাদপত্র চালাইতে শিখিয়াছেন এবং পুরুষার্থ-মাত্র-বিবর্জ্জিত হইয়া বাক্য-বাগীশত্ব লাভ করিয়াছেন। (১)

(১) গত এপ্রিল সংখ্যা কণ্টেম্পোরারি রিভিউ তে প্রফেসর গোল্ডুইন স্মিথ তাঁহার (Expansion of England)) 'ইংলণ্ডের অঙ্গ বিস্তার' শীর্ষক প্রবন্ধে আধুনিক শিক্ষিতবাঙ্গালীসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মার্জ্জিতবুদ্ধি বাঙ্গালী তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ইলবার্টবিলসত্ত্বেও ইংলণ্ডের অঙ্গবিস্তৃতির ফল, অতএব ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ হইবে। প্রাজ্ঞ প্রফেসরের কথা প্রকৃত? কিন্তু ইংরাজের তিরোধানে বাঙ্গালীর অস্তিত্বলোপ হইবে কেন? মিঃ স্মিথ বলেন, ইংরাজ চলিয়া গেলে তাঁহাতে শাসন ও শৃঙ্খলা উভয়ই যুগপৎ ধ্বংশ হইবে। অতএব বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে কে? বাঙ্গালী আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও আত্মশাসনে অপটু। ঠিক কথা। বাঙ্গালী আত্মরক্ষণ ও আত্মশাসন উভয় ক্ষমতাই হারাইয়াছে। কিন্তু হারাইল কি রূপে? হারাইয়াছে—ইংরাজের শাসনগুণে। ইংরাজশাসিত দেশে আত্মরক্ষণের উপায় ও আত্মশাসনের বীজ নষ্ট হওয়াই নিয়ম। নিয়ম বলিয়াই আইরিশ বিক্ষোভ, কাবুলের ক্যাভাগ্নারী হত্যাকাণ্ড ও অদ্যকার মাহাদী গাড়ন অভিনয়,—নিয়ম বলিয়াই বাঙ্গালী আত্মশাসনে অপটু ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। বাঙ্গালীর কখন 'ঢাল খাঁড়া' গুলি গোলা ছিল কি না, জানি না, কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, বাঙ্গালীর 'লাঠি' ছিল, ইংরাজ শাসনে সে লাঠি গিয়াছে। ইংরাজের আমলে বাঙ্গালীর 'বীরস্য' লাঠি ননীর পুতুলী বাবুদের ছড়িতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার লাঠি গিয়াছে, আত্মশাসনের 'পঞ্চাইত' গিয়াছে। বাঙ্গালীর এখন আর নিজের কিছুই নাই। তাহার এখন যাহা কিছু আছে, তাহা ইংরাজ প্রদত্ত। বাঙ্গালীর গায়ে বল নাই, কিন্তু গায়ে জ্বালা আছে। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গায়ের জ্বালায় যদি দুইটা কথা বলে, তাহাতে ইংরাজ চটিবেন না। ইংরাজ ভিন্ন এখন আর বাঙ্গালীর কেহ নাই। বাঙ্গালী ইংরাজসৃষ্ট জীব ও ইংরাজের মন্ত্রশিষ্য। অতএব ইংরাজ, বাঙ্গালীর দোষ লইবেন না, যদি তাঁহার প্রদত্ত কোন গুণে সে গুণী হইয়া থাকে, তাহাই গ্রহণ করিয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিবেন।

নির্ণীত হওয়া সম্ভব না। আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষসম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে বঙ্গসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতি-বেত্তা, সমাজসংস্কারক, ইতিবৃত্ত লেখক প্রভৃতি অনেকেই স্বস্ব প্রয়োজন ও অধিকারানুসারে অল্পাধিকপরিমাণে সমাজতত্ত্বের অনুশীলন করেন,—জীবনসমস্যার মীমাংসার্থে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে বাধ্য হন। ইঁহাদের সূক্ষ্ম ও সমধিক পুঙ্খানুপুঙ্খতাসম্পন্ন চিত্তে সমাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করা হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের আভ্যন্তরিক ভাবনিচয় সম্যকরূপে প্রায়শই পরিস্ফুট হয় না, যেটী সমাজের সর্ব্বপ্রধান 'আলম্বন', হয়ত সেইটীই অপ্রকাশ থাকিয়া যায়। অতএব সমাজের আভ্যন্তরিক ভাবের পরিস্ফুট ও সজীব মূর্ত্তি দেখিতে হইলে কাব্য গ্রন্থে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। কবি অতি অল্প কথায় সমাজের অঙ্গবিশেষের চিত্র অঙ্কিত করেন। হয়ত সমাজস্থ দুই চারিজনমাত্র ব্যক্তির চরিত্র প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাহাতেই সমগ্র সমাজের আভ্যন্তরিক গূঢ়ভাব, প্রধান সারাংশ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কবি-কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে অতীত পুনরুজ্জীবিত হইয়া বর্ত্তমানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজ যে ভাবে ও যে সকল অবস্থার সমবায়ে পরিচালিত হইত, যাহা হইতে নিজের জীবনীশক্তি গ্রহণ করিত ও যাহা তাহার উন্নতির অন্তরায় ও অবনতির কারণ হইয়াছিল, তাহা—সেই সমস্ত অবস্থা ভাব ও শক্তি, পরম্পরা, কালক্রমে ও সমাজের পরিবর্ত্তনশীলতার প্রভাবে বিস্মৃতির গভীরতর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলেও, কবির কমনী শক্তিসংযোগে পুনর্ব্বার সজীবতাসম্পন্ন হইতে পারে ও আপনাদিগের অতীত অস্তিত্ব ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করিতে সমর্থ হয়। কবি ভিন্ন সাহিত্যসংসারে আর কেহই মৃতকে জীবিত করিতে পারেন না। মৃত জীবিত না হইলে প্রায়ই জীবিতের ব্যবহারে আইসে না।

'দেবীচৌধুরাণী'—বঙ্গের কবিকুল-চূড়ামনি পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব অক্ষয়কীর্ত্তি। দেবীচৌধুরাণী কাব্যে এক শতাব্দী পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজ চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্গ সমাজ বলিলাম, ইহাতে এমত বুঝিতে হইবে না যে, কবি ইতিহাসলেখকের ন্যায় সমগ্র বঙ্গ সমাজের তৎকালিক আচার, ব্যবহার, রীতি,নীতি, ক্রিয়া,কলাপ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। কবি তাহা কিছুই করেন নাই, কিন্তু যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। তাহাতেই এক শতাব্দী পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজ জীবিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণী-কাব্যে উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার পল্লীগ্রামবিশেষের একটী পরিবারের কয়েকটীমাত্র ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, জীবনের দুই একটী মাত্র ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেই তৎকালিক সমগ্র সমাজ অর্থাৎ সমাজের মূলনিহিত সারসত্তা সপ্রকাশ। এই সত্তা অবলম্বনে সমাজসংস্কারক, ইতিবৃত্তলেখক ও বৈজ্ঞানিক স্বস্ব প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন। পরন্তু রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের সাধারণ ছাত্র ও কর্ম্মজগতের যাবতীয় প্রাণী দেবীচৌধুরাণীর আখ্যায়িকা হইতে অতি মূল্যবান সিদ্ধান্ত ও সারবান

উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

কিন্তু কেন? একখানা উপন্যাসগ্রন্থ বৈত নয়? উহা হইতে আবার উপদেশ গ্রহণ করিব কি? উপদেশ গ্রহণ করিবার, 'উপপত্তি' নিষ্কাসিত করিবার কি আর স্থান নাই? যে কবির কোমল মস্তিষ্কজাত কল্পনা প্রসূত দুইটা উপকথার আশয় গ্রহণ করিব? নিষ্কর্ম্মা পুরস্ত্রী, তরলমতি বিদ্যালয়ের বালক আর অর্দ্ধশিক্ষিত 'ললিতলবঙ্গলতা'-সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকবৃন্দের হস্তেই উপন্যাসাদি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ শোভা পায়। তাহারাই উহার রসাস্বাদন করুক। তাহারা দন্তহীন, কঠিন দ্রব্য চিবাইতে পারে না; অতএব কাব্যরসপান করুক। আমি মিল্‌ কোমত্‌ বেন্থামের শিষ্য, তাহাতে, আপাততঃ ভারত উদ্ধার ব্রতে ব্রতী, রাজনৈতিক-বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চশাখায় আরোহণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপর দৃষ্টি চালাইতেছি। আমি এখন উপন্যাস পড়িতে বসিব? তাহাতে বাঙ্গালা উপন্যাস। জর্জ্জ্‌ ইলিয়ট্‌, মস্‌িধ জোলা, পঞ্চব হুগো প্রভৃতির প্রতিই যখন [illegible] আর তোমার এ-গুণ্ডার নাম করিতেছ কি?'

প্রিয় দার্শনিক! প্রিয়তর ভাবি-ভারত-উদ্ধারক রাজনৈতিক। কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা ও তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করা আপনার পক্ষে অনুপযুক্ত তাহাতে অবশ্য সন্দেহ কি? বিশেষতঃ বাঙ্গালা কাব্য, দেশীয় ভাষায় লিখিত উপন্যাস,—ললিত-লবঙ্গ-লতানুগামী ননির পুত্তলী ম্যাংগ্লো-ভার্ণাকিউলার যুবাই পাঠ করুক; মহাশয় করিবেন কেন? যদিচ রসকল্পে [illegible] ভারতচন্দ্রের শ্রোতা ও 'দাশরথির' সপ্ত স্রোতা সিঞ্চিত ধন, কিন্তু তাহাতে কি? সম্প্রতি আপনি ভারত উদ্ধার-কার্য্যে ব্যাপৃত, পোলিটিক্সে মগ্ন। আইস ম্যাজিবল্‌ডি, গাম্বেটা, কশথ, ম্যাট্‌সিনি, দবহ—ললিতলবঙ্গলতা ও তাহাদের পোসীগোত্র, নতুবা বাঙ্গালিবাবুর রুচি মার্জ্জিত হইবে না,—ভারত উদ্ধারের গোল বাধিবে। কিন্তু এত লুকোচুরি ঢাকাঢাকি করিয়াও যে সোণার বাঙ্গালায় ডন্‌ জুয়ানের অবতারের অবতার তন্ত্র-অবতারেরই আবির্ভাব হইতেছে, ইহাই যাহা খেদ! অনর্থক ও অর্থশূন্য লুকোচুরিতে ডন জুয়ান জন্মে, ইহা অগাধ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনেজ বুঝিতেন কি না জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে, 'নব্য বঙ্গের সাইলোজফারগণ' বুঝেন না। না বুঝাতেই 'ইতঃনষ্টস্ততোনষ্টের' কারবার চলিতেছে।

যাহা হউক, কাব্যগ্রন্থপাঠ হয় নাই কথা। কাব্যের উদ্দেশ্য কি? শিক্ষিত ও বঙ্কিম-মাত্রেই জানেন যে, কাব্যের [illegible] সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, দ্বিতীয়—চিত্তশুদ্ধি সমালোচনা সৌন্দর্য্যবৈচিত্র্যদ্বারা মনুষ্যের কবে, উপসম্পাদন করাই কাব্যের উদ্দেশ্য ই করে। কাব্য পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মে, পণ্যে-জন্মে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভোগ করিতে পারে ও তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারে এমত লোকও অতি অল্প। 'কাব্যামৃত-রসাস্বাদ' সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যাহার ঘটে, তাহার স্বর্গসুখ। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য পড়ে অনেকে,—বুঝে কয়জনে? প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় কয় জনে? যে কয় জনে বুঝে—সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে আবার উপকৃত হয় কয়জনে? চিত্ত-

শুদ্ধি হয় কাটা লোকের? এ সম্বন্ধে ললিত লবঙ্গলতাপবাদগ্রস্ত বঙ্গীয় যুবক ও ম্যাট্‌সিনি-বাবু-পূর্ণ-মস্তিষ্ক পিয়রিটানিক মেজাজের ভাবত উদ্ধারক উভয়ই সমান। কাব্য গায়ে মাখে, কি, পেতে শোয় কিম্বা পুরাণ জ্বরের ঔষধে লাগে,—ইঁহাদের কেহই জানেন না, উভয়েরই সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি একই প্রকার। এক জন কাব্যাকাব্য সমস্তই পাঠ করেন, আনন্দ মঠ' হইতে 'মোহন্ত এলোকেশী' পর্য্যন্ত দুই চক্ষু যাহা দেখেন কিছুই ছাড়েন না, যে স্থানেই হউক 'মদন ভস্মের' ও 'নবীন বসন্তের' ছিটা ফোটা পাইলেই হইল, ক্রমাগত তাহা চাটিতে থাকেন, চাটিতে চাটিতে সেই পলিত গলিত 'রস'টুককে, তদ্রোধিক রসনাটীকে, সমালয়ে প্রেরণ করিয়া তবে ক্ষান্ত হন। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি

[illegible] শুনি[illegible] তফাৎ থাকেন, [illegible] তাব আঁচ লাগিয়া [illegible] । ইঁহার আত্মা এতদূর পবিত্র [illegible] কের দিকে এত ঝোঁক যে, [illegible] লটা ফলটা দেখিলেও শিহরিয়া ইনি 'দেশের উপকার' 'আর সমগ্র [illegible] জাতির উদ্ধার' লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; চারিদিকে উহাই হাতড়াইতেছেন। 'উপকার' আর 'উদ্ধার' এই দুইটা শব্দ বড় বড় অক্ষরে যাহাতে লেখা না থাকে তাহা কদাচ তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হয় না।

'দেবী চৌধুরাণী' কাব্যের অন্যান্য কথা অবতারণা করার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের লোকদিগকে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; কেন না কাব্যখানির গুণাগুণ সম্বন্ধে সেই কথাটাই তাহাদের বিশেষ কাযে আসিবে। কথাটা এই যে বঙ্কিমবাবু এই প্রবীন বয়সেও একটা কারবার ছাড়েন নাই। কোন কারবার? নীতি-পঞ্জিকা-বিগর্হিত, সম্মার্জ্জিতরুচি-বিবর্জ্জিত সেই চুম্বনের কারবারটার কথা বলিতেছিলাম। নিষ্কাম কর্ম্ম ও চুম্বন দেবী চৌধুরাণীতে একত্রে 'গলাগালি'।।। কি সর্ব্বনাশ! দেবীচৌধুরাণীর নায়ক 'না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া যেখানে—নাসিকার বড় ডবডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—আ ছি ছি। সেই স্থানে হঠাৎ চুম্বিত করিলেন।' হরি হরি, কি ভয়ঙ্করী অশ্লীলতা! কিন্তু বঙ্কিমবাবু সাধুজন-অসম্মত কাযটার নিজেই সমালোচনা করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন,—গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এই খানেই এ বই পড়া বন্ধ করিবেন'। আমারাও বঙ্কিম[illegible] লুথার ও ম্যাট্‌সিনিদিগকে ঐ সৎপরামর্শ দিতে বাধ্য, কেন না, গ্রন্থের অ একস্থানেও 'বিবশ বিহ্বল হইয়া অ নিষিক্ত বিম্বাধরে পুনরায় [illegible] -ছি ছি কারখানা।

এ স্থলে সৌন্দর্য্যানুভবক্ষম রসিক পাঠকের নিকট একটা প্রশ্ন। তিনি উপরোক্ত দুইটা ব্যাপারের কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন? প্রথমটার দ্বারা দ্বিতীয়টার সমন্বয় করিবেন, না, দ্বিতীয়টার দ্বারা প্রথমটার?

আধুনিক বঙ্গে দুইটী লোকের যুগপৎ অভ্যুদয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সমালোচ্য। এই দুই ব্যক্তির কার্য্যে অনুধাবনের সামগ্রী অনেক আছে; কিন্তু আজ

ধাবন করিবার লোক অতি অল্প। ইহাঁরা উভয়েই ইংরেজী-শিক্ষার অতি সারবান্ ফল, কিন্তু উভয়েই রাজনৈতিক চীৎকার-বিবর্জিত। উভয়েই সম্পূর্ণ বিপরীত পথে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী হইয়া জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে একই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত। উভয়েরই প্রতিভা অতুলনীয়া, উভয়েরই প্রাণ প্রেমপূর্ণ উভয়েরই কবিত্ব উচ্চ গগনস্পর্শী—উভয়েই অক্ষয়কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছে। শত্রু মিত্র উভয়েরই আছে, কিন্তু আক্ষেপ এই যে, শত্রুমিত্র উভয়েই ইঁহাদিগকে পদদলিত—লাঞ্ছিত—করিয়াছে ও করিতেছে, শত্রুমিত্র কেহই তাঁহাদিগকে চিনে নাই, তাহাদিগের কার্য্যের প্রকৃত সারবত্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া অযথা অর্থ করিয়াছে, অন্যায় নিন্দা প্রশংসা করিয়াছে ও করিতেছে। এই দুই ব্যক্তির একজন শত্রুমিত্র উভয়েরই কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইয়া কিয়দ্দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। অপর ব্যক্তি,—আমাদের পরম সৌভাগ্য—এখনও স্বকীয় অনুপম প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন, সেই প্রতিভার দ্বারা বঙ্গভূমি আলোকিত হইতেছে। কাহাকেও বোধ হয় বলিতে হইবে না যে আমরা বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরই উল্লেখ করিতেছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় কেশবচন্দ্রের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের রসময়ী কবিতা,—উভয়ই স্বতন্ত্র আকারে একই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃতা। সে উদ্দেশ্য—মানব প্রকৃতির অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া তাহার 'চিত্তশুদ্ধি'-বিধান করা। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি? মুনিবাক্যের ও কবিকল্পনার যথার্থ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি কি? তরলমতি বঙ্গীয়ভ্রাতা ইহার উত্তর দিন।

কোন সমাজই কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ক্ষমতার অতীত হইতে পারে না। বঙ্গসমাজ এই দুই ব্যক্তির যে অসীম ক্ষমতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। নব্যবঙ্গ হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় কেশব ও বঙ্কিমের ভাবস্পৃষ্ট হইয়াছে, অথচ এই দুই ব্যক্তি যে মহান্ ভাবের ভাবুক, যাহা হইতে ভাবমাত্রই প্রণোদিত হয়, তাহা অনুধাবন ও অনুভব অতি অল্পেই করিয়াছে, বহির্ভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছে, অন্তর্ভাবের প্রতি লক্ষ্য করে নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, মহাজনদ্বয়ের উদ্দেশ্য অসাধিত রহিয়াছে, যতটুকু সাধিত হওয়া সম্ভব, তাহাও হয় নাই। কেন বাঙ্গালী যুবক কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ করে না? অনেকে নিন্দা করে,—অনেকে হিংসা করে,—সমালোচনা করে, তিরস্কার করে, অগ্রাহ্য করে, উপদেশ দেয়, কিন্তু অনুকরণ সকলই করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অনুকরণ দুর্ব্বলতা-প্রণোদিত,—বাহিরের ও বাক্যের অনুকরণ, ভিতরের ও কার্য্যের অনুকরণ নয়; 'নয়' বলিয়াই বাঙ্গালীর লঘুচিত্ত 'হাওয়ায়' উড়ে,—'নয়' বলিয়াই অনেক 'দেবেন্দ্র' অনেক 'গোবিন্দলাল' দেখা দিতেছে, বঙ্গসমাজে একটী 'ব্রজেশ্বর' বা আধখানি 'চন্দ্রশেখরের' সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে না।

ইত্যগ্রেই বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে যে, 'দেবী চৌধুরাণী' কাব্যে বঙ্গের এক শতাব্দী পূর্ব্বের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত

করা হইয়াছে। যে সকল দ্রব্যের সমবায়ে এক শতাব্দী পূর্ব্বের বঙ্গসমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, যে সকল আচার ও অবস্থা উহার উন্নতি ও অধোগতির পরিবর্ত্তন ও পাপাসক্তির কারণ হইয়াছিল,—সেই সকল দ্রব্য, আচার ও অবস্থার অধিকাংশই অদ্যকার বঙ্গসমাজ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। দুই চারিটী যায় যায় যাইতেছে না, শীঘ্রই হয়ত যাইবে, এক আধটীর রেখামাত্র—চিহ্ন মাত্র আছে। বঙ্গ-সমাজ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে প্রবেশ করিতেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা পরবর্ত্তীর অভ্যন্তরে এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে নাই, পূর্ব্ববর্ত্তীর সহিত এখনও সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে ও পরবর্ত্তীতে এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই। বঙ্গসমাজের বিশাল কলেবরের অধিকাংশ পরবর্ত্তীতে, কিয়দংশ পূর্ব্ববর্ত্তীতে ও অবশিষ্টাংশ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথে অবস্থিত। অবস্থাটী বিশেষ অনুধাবনের বিষয়, কবিকল্পনার ও দার্শনিকের চিন্তার উদ্দীপক, উভয়কেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ, একের দ্বারা চিত্রিত ও অপর কর্ত্তৃক আলোড়িত হইবার যোগ্য। 'দেবী চৌধুরাণী' কাব্য এই অবস্থার আংশিক চিত্র, অন্য এক অধ্যায়। 'দেবী চৌধুরাণীর' কবি অদ্যকার সমাজে থাকিয়া, অদ্যকার সমাজ সম্মুখে রাখিয়া, শতাব্দী পূর্ব্বের সমাজচিত্র আঁকিয়াছেন, অতএব বর্ত্তমানের আভা অতীতের অঙ্গে ঈষৎ প্রতিফলিত হইয়াছে। চিত্রখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

যৎকালে বঙ্গদেশে ইংরেজশাসন বদ্ধমূল হয় নাই, ইংরেজের আইন আদালত হয় নাই, পিনালকোড্ হয় নাই; ইংরেজের শাসনদণ্ড যৎকালে দুর্ব্বল ও অদৃঢ়;—যৎকালে বাঙ্গালী লাঠি ধরিতে জানিত, লাঠির জোরে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিত, লাঠির আগায় পিনালকোড্ প্রচার করিত, যৎকালে বাঙ্গালীর লাঠিতে সঙ্গিন-বন্দুক চূর্ণ হইত, তরবারী গুঁড়া হইয়া যাইত, গুলি-গোলা তফাৎ থাকিত, যৎকালে বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত বীর্য্যবান, বীরোচিত বৃত্তির অভাবে যৎকালে মমতাশালী লোকমাত্রেই ডাকাইতি করিতে কুণ্ঠিত হইত না, যৎকালে ডাকাইতিতে নিন্দা বা লজ্জার বিশেষ কারণ ছিল না, যৎকালে উহা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, দুঃখীর দুঃখবিমোচন ও সৎকার্য্যে দানের নামান্তরমাত্র ছিল, যৎকালে দুর্ব্বল ও গণ্ডমূর্খ ব্যতীত আর কেহও 'গোবেচারা ভাল মানুষ' হইত না; যৎকালে আর্য্য পিতৃভক্তি গৃহিনীর অঞ্চলস্থ হয় নাই, যৎকালে

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতার প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ'

এই মহার্ঘ কথা শ্রদ্ধা বিহীন শ্রাদ্ধের অর্থশূন্য মন্ত্রে সর্ব্বতোভাবে পরিণত হয় নাই, যৎকালে কুলকামিনীগণ ঘোমটা ত্যাগ করেন নাই, পত্নী পতিসেবা ত্যাগ করেন নাই, পতি পত্নীর গোলাম হয়েন নাই; যৎকালে বহুপত্নীত্বসত্ত্বেও পত্নীর কদাচিৎ অনাদর হইত, তৎকালের—সেই সময়ের সামাজিক চিত্র 'দেবী চৌধুরাণী' কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' ইতিবৃত্তমূলক কাব্য নহে; ইতিহাসের কয়েকটী নামমাত্র উহাতে আছে। দেবীচৌধুরাণী ও তাঁহার দীক্ষাগুরু ভবানীপাঠক সম্বন্ধে ডাক্তার হণ্টারের 'Statistical account of Rungpur' গ্রন্থে [illegible]

(১) . তাহার সহিত সমা- । বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। াসী ভবানীপাঠক এক জন দলপতি ছিলেন, দস্যাদি নেত্রী দেবীচৌধুরাণীর সহিত ; সম্বন্ধ ছিল। দেবী নৌকায় রতেন, বহুসংখ্যক বরকন্দাজ সেনা যতেন এবং তাঁহার চৌধুরাণী নাম ধারী থাকার পরিচায়ক'। ইতিহাস । আছে, তাহা এই। কাপ্তেন যাহা য়াছেন, তাহা উহার ছায়া, উহার এবং উহা যে সময়ের কথা সেই যর ছায়া। সময়টীর কিঞ্চিৎ পরিচয় র দিয়াছি আরও একটু দিব,— ার হণ্টরের গ্রন্থ হইতে একটু হাসিক পরিচয় দিব।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গালা ছারখার

) ডাক্তার হণ্টারের গ্রন্থে দেবীচৌধুরাণী বিষয়োদ্ধৃত কথা কয়েকটী ভিন্ন আর একটী ই,—

tch a glimpse from the ngal's report of a

করিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রায় সমগ্র উত্তর-বঙ্গ—জিলা রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রংপুর—দেওয়ান দেবীসিংহের বেনামি ইজারা। ইজারার বন্দোবস্ত 'তেশালা' ১৭৮১ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। কার্য্যকর্ম্মে সুশৃঙ্খলা না থাকায় প্রথমাবধি মহাল বাকী পড়িয়া আসিতেছিল। ইজারার মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ছয়লক্ষ টাকা বাকী পড়িল। মহাল 'হাতছাড়া' হইবার পূর্ব্বেই এই টাকা আদায় করা আবশ্যক। ইজারাদার দেবীসিংহ, এতদর্থে দর-ইজারাদার হরকরা, টাকার জন্যে প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। এই পীড়ন দুর্ব্বিসহ—পৈশাচিক। ইহার বিষয় 'সমুদ্রপারে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া বাগ্মিপ্রবর এডমন্ড বর্ক্ জ্বালাময় ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, দেবীসিংহের নাম অমরত্বলাভ করিয়াছে। দেবী সিংহের অমানুষী অত্যাচারে ১৭৮৩ সালে প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিল। প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া তহশীলদার ও রেভিনিউ অফিসরদিগকে তাড়াইতে লাগিল। কোচবেহারের প্রজাগণ বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ দিল। কলেক্টর সাহেব শান্তিসংস্থাপনার্থে কোন কোন 'আবোয়াব' ও টাকার বাঁটা (১)। উঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল ফলিল না। বিদ্রোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতে লাগিল (২)।

এই সময়েই ভবানীপাঠক, দেবী চৌধু- তাহাদিগের দলবলের প্রাদুর্ভাব

বন্দোবস্ত 'আরকটী' টাকার ত 'আরাবলী' মুদ্রার

অতুলনীয় কবি, ইঁহাদের গগণস্পর্শিনী-
বা-সম্ভূত সৃষ্টির সহিত ক্ষীণপ্রাণ আধু-
ঙ্গালিকবির দ্বারা অঙ্কিত চিত্রবিশে-
না করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত
, ইহা নহে। মূল কথা এই যে,
ব্যতীত তুলনা হয় না। স্থান,
অবস্থা ভেদে মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতির
র্থক্য ঘটা সম্ভাবিত না হইলেও,
াশের তারতম্য হয়। সতী-
, বিশেষতঃ কাব্যের নায়িকামাত্রেই,
প্রেমের প্রতিকৃতি। কিন্তু সেই প্রেমের
রূপ আকুঞ্চন ও প্রসারণ আছে, কত
র গতি আছে! স্বভাব ও সংসারের
ত প্রেমপ্রসারণের সামঞ্জস্য রাখিয়া
া কবি সৌন্দর্য্যবৈচিত্র দেখাইতে পারেন,
হারই নৈপুণ্য সাধারণতঃ প্রশংসনীয়।
ারে যে কয়টী জগদ্বিখ্যাত নারীচরিত্রের
উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই পতিপ্রেমে
ও স্বভাবসৌন্দর্য্যে গরীয়সী। কিন্তু সক-
লেরই সৌন্দর্য্য ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরি-
ণ্ট, ভিন্ন ভিন্ন গতিবিশিষ্ট, অথচ আবেগ
প্রাখর্য্যে সকলেরই প্রেম ও সৌন্দর্য্য
সমস্থানীয়। এই সকল রমণীরত্নের মধ্যে
কোন কোনটীর একের সহিত অপরের
অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিতে পারে; কিন্তু
স সকল সাদৃশ্যও পার্থক্য-পরিবেষ্টিত।
ফলতঃ স্থান, কাল ও অবস্থার তারতম্য-
অনুসারে কবি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন
গতি নির্দ্দেশ করেন, অতএব উপর্য্যুক্ত
চরিত্রনির্ণয়ের মধ্যে একটীকে অপরটী
অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলা যাইতে
পারে না। যাহা হউক, তুল্যবস্তু ব্যতীত
তুলনা হয় না। প্রফুল্লের সহিত ঐ সকল
রমণীরত্নের তুলনা হয় না কেন? ইঁহারা
কেহ ঋষিকন্যা, কেহ রাজকন্যা, কেহ
কেহ অমানুষী শক্তির আশ্রিতা ও
তদ্দ্বারা সংরক্ষিতা; কেহ বনলতা,
কেহ উদ্যানলতা;—সকলেই কুসুম-
সুকুমার সারল্যের পুত্তলী, কঠিন সংসা-
রের সহিত ইঁহাদের অনেকেরই সংশ্রব
অতি অল্প। অতএব ইঁহাদের সহিত প্রফু-
ল্লের তুলনা হইতে পারে না। প্রফুল্ল
রক্তমাংসে মানবী, কুসংস্কারসম্পন্না বঙ্গ-
সমাজের রমণী, সপত্নীসঙ্কুল পতিগৃহে
দাসীবৃত্তি করিতে যাইয়াও প্রত্যাখ্যাতা,
দারিদ্র্যপ্রপীড়িতা, প্রলোভনপরিবেষ্টিতা,
অনাথা, আশ্রয়মাত্রবিহীনা, নির্ম্মম
সংসারে নিঃসহায় অবস্থায় নিক্ষিপ্তা।
অন্যার সহিত ইঁহার তুলনা হয় না। প্রফু-
ল্লের রূপযৌবন ছিল, সৎসাহস প্রভৃতি
স্বাভাবিক গুণ অনেক ছিল; কিন্তু সে তাহা
জানিত না। কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রফুল্লের এক-
মাত্র সম্বল,—সেই সম্বল বুকে বাঁধিয়া
প্রফুল্ল অপার সংসার সাগরে ঝাঁপদিল।
ঝাঁপ দিল না;—ঝাঁপ দিতে বাধ্য হইল।
অপার সংসার? অপারই বটে! কয়টা
লোক উহা পার হইতে পারে? কে না
উহার পূতিগন্ধময় পঙ্কে ডুবিয়া যায়? প্রফুল্ল
ডুবিল না। সামান্যা নারী হইয়াও ডুবিল
না। সাগরের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে
বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সেই অপূর্ব্ব
মধুরিমাময় কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রভাবে প্রফুল্ল
সংসার উত্তীর্ণ হইল; কিন্তু সংসারবন্ধন ছেদ
করিল না, ইচ্ছা করিলে করিতে পারিত, কিন্তু
করিল না; কেন না, প্রফুল্ল কর্ম্মময়ী। প্রফুল্ল
জানিত না যে, ভক্তি এক, ভালবাসা আর;
তাহার অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বসিত ভালবাসা
অতলস্পর্শী সিন্ধুর ভক্তিস্রোতে

গিয়াছিল, লুকাইয়া যায় নাই। প্রফুল্লের নিকট ভক্তি ও ভালবাসা একই স্রোতে চলে। হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। প্রফুল্ল যখন কেবল পতি দেখিয়াছিল মাত্র, পতিপ্রেমের অধিকারিণী হয় নাই,—পতি কতটুকু প্রেম তাহাকে দিতে পারেন তাহাও ভাল করিয়া বুঝে নাই,—তখনই স্বয়ং 'শ্রীকৃষ্ণেও তাহার মন উঠে না'। পতির প্রেম ইহা অপেক্ষা অধিক আর কত হইতে পারে? 'ভালবাসা এক, ভক্তি আর'—প্রফুল্ল তাহা জানিত না, বুঝিত না,—সে সময়ে তাহার নিকট দুইই নূতন। কিন্তু জানিত, বুঝিত, অনুভব করিত যে, 'মেয়ে মানুষের ভক্তির শেষ নাই'। কবির এই ভাবদ্বয়ের সমাবেশ যারপরনাই সুন্দর, অপূর্ব্ব।

প্রফুল্লের কর্ত্তব্যজ্ঞানের কথা বলিতে ছিলাম। উহা তাহার স্বাভাবিক সম্পত্তি। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় অবস্থাতেই একই রূপ। প্রফুল্ল যখন পণ্ডিতাগ্রগণ্যা পণ্ডিত, গীতাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, যোগসাধনে রত,—কিম্বা যখন সে নিরক্ষর, বঙ্গগৃহের অবলাধম;—উভয় সময়েই তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান গগণস্পর্শী। হিন্দুর মেয়ে যাহা করিতে নাই তাহা করিবে কেন? আর যাহা করিতে আছে, করিতে হয়, করা কর্ত্তব্য,—তাহা অবশ্যই করিবে, ইহাতে পৃথিবী থাক্ আর রসাতলে যাক্। প্রফুল্ল যখন অতুল ধন-রাশি কুড়াইয়া পাইয়াছে, ভবানী ঠাকুর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই ধন লইয়া কি করিবে?' প্রফুল্ল, স্বভাবসুলভ সরলতার সহিত বলিলেন "ভোগ করিব"। প্রফুল্লের কথায় ভবানী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন তাহাকে তিনি ভোগের অর্থ বুঝাইলেন, পুণ্যসঞ্চয়সম্বন্ধে দুই একটী ক বলিয়া নরকের পথের পরিষ্কার ব করিলেন এবং শেষ জিজ্ঞাসা ক "প্রফুল্ল কোন্ পথে যাইবে?" প্র করিল, "বাবা, আমি গৃহস্থের ে নও পাপ জানি না; আমি কেন যাইব? আমি বড় বাঙ্গাল, আ বস্ত্র জুটিলেই ঢের। আমি ধন আমার দিনপাত হইলেই হইল। সব নাও, আমি নিষ্পাপে যাতে অন্ন পাই, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দ

তা'র পর প্রফুল্ল যখন জ্ঞানী, নানা বি উপার্জ্জন করিয়াছে, যখন কাব্য-ব্যা ন্যায় সাংখ্য আয়ত্তাধীন করিয়া গীত অধ্যয়ন করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা বুঝিতেছে,—যখন ভবানীঠাকুরের আদে অনুসারে "লুন লঙ্কা" খাইতেছে; নি হারে নানাকষ্টে 'চিত্ত সংযম' শিক্ষা দ তেছে, তখনও 'একাদশীর দিন মাছ খাওয় ছাড়ে নাই। কেন ছাড়িবে? সে বাঙ্গালী মেয়ে, সধবা স্ত্রীলোক, একাদশীতে মাছ খাইলে যেপতির অমঙ্গল বুঝায়। সেই জন প্রফুল্ল সমস্ত বুঝিয়া পড়িয়া, কুসংস্কারবি র্জ্জিত, তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়সংযম-ব্রতে শিক্ষিত হইয়াও বাঙ্গালীর মেয়ের সেই সুমধুর সরল সংস্কার ছাড়িল না; অন্যান্য দিন অনাহারেও থাকিবে, কিন্তু একাদশীতে মাছ চাই। প্রফুল্ল সে দিন কাদা ছানিয়া কাপড় ছাঁকা দিয়াও দুটী মাছ ধরিবে; কোনরূপে ব্রতরক্ষা করা চাইই চাই। প্রফুল্লমুখীর একাদশীতে মাছ খাওয়া ভবানী পাঠক ছাড়াইতে পারেন নাই; তাঁহার ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ একত্রিত হইলেও পারিতেন না। প্রফুল্ল যাহা নিজে ছাড়িবে না,

ক ছাড়াইতে পারে?

দীতে মাছখাওয়ার মধ্যে
লবাসা, কত পতিভক্তি,
লুক্কায়িত। রাশি রাশি
। তাহার শতাংশের একাং
া করা যায় না। ঐ একটীমাত্র
াতে প্রফুল্লচরিত্রের অনেক কথা
ছে, তাহার পতিপ্রাণতার পরা
ান হইয়াছে।

লের পতিপ্রেম পরি
প্রসাদী কর্ত্তব্যজ্ঞানের
তাই বলিয়া কি সে প্রেম আবেগ-
না উচ্ছ্বাসশূন্য? প্রফুল্লের প্রেমরূপ
ধ জলধির উপরিভাগ বাহ্যতঃ স্থির চাঞ্চ
হীন হইলেও উহার নিম্নস্তর যে কিরূপ
লীলায় তরঙ্গায়িত, বা বায়ুসংক্ষুব্ধ কি
উচ্ছ্বাসপরিপ্লাবিত, তাহা নিশীঠাকুরাণী
ক্ষ্য বুঝিতেছেন; দিবাও কতকটা না
ত, এমত নহে। প্রফুল্লর প্রেম তাহার
জ্ঞানের অংশ হইলেও, উহা কোন
শ পৃথিবীর অন্যান্য রমণীবৃন্দ অপেক্ষা
ন বা অপ্রখর নহে।

বহুকালের পর ব্রজেশ্বরের সহিত প্রফু-
ল্লের প্রথম সাক্ষাৎ 'কালসাঁজীর' ঘাটে।
পাঠক স্থান কাল আর সেই রাত্রের ঘটনা
স্মরণ করুন আর যদি পারেন, প্রফুল্লহৃদয়ের
কিয়দংশ অবলোকন করিয়া লউন, তাহা
হইলে কতকটা বুঝিতে পারিবেন, সেই
কাঙ্গালিনী দেবীরাণী সন্ন্যাসিনীর প্রেমে
কত আবেগ, কত উৎকণ্ঠা, কত উচ্ছ্বাস!
নিশী পোড়ারমুখী তাহা দেখিয়াছিল, তাই
বলিয়াছিল, "এই কি, মা, তোমার নিষ্কাম
ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায়
মা, এখন"?

তারপর একদিন সেই বৈশাখী শুক্ল-
পঞ্চমীর ভয়ানক দিন। হরবল্লভ রায় মহা-
শয় নিজে গোইন্দা হইয়া কোম্পানির
সিপাহী লইয়া দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে
গেলেন, সেই দিনের কথা বলিতেছি।
দেবীর চর সর্ব্বত্র ফিরিত, অতএব দেবী
অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন—যাহা
ঘটিবে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যসামন্ত সমস্ত
লোকজন দিবার দিবা নিঃসহায়ে সেই
। মধ্যে আসিলেন কেন? আসি-
আর একবার দেখিবেন বলিয়া।
এই দেখার মধ্যে যে কত প্রেম, তাহা
কেহ নিজে না বুঝিতে পারিলে বুঝাইবার
চেষ্টা করা বৃথা।

প্রফুল্ল পতিগৃহে যাইয়া 'ঘরণী গৃহিণী'
হইতে পাইবেন পতিস্নেহের অংশ পাইবেন,—
ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি জানি-
তেন তাঁহার সে সাধ মিটিবার উপায় নাই;
হৃদয়ের—জীবনের—সেই একমাত্র অভিলাষ
পূর্ণ হইবার উপায় নাই। জানিতেন তাঁহার
সে পথ রুদ্ধ। তাই আর একবার দেখিবার
মাত্র বড় সাধ। দেখা হইল, যেটী তাঁর বড়
সাধ ছিল, অথচ অসঙ্গত নহে, সেটী মিটিল;
তখন আর বাঁচিয়া কি হইবে। "তোমার
দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা
বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস তাহাও
শুনিলাম (প্রফুল্ল এতদিন তাহাও শুনে
নাই), আমার যে কিছু ধন ছিল তাহাও
বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন
বাঁচিয়া কোন্ কায করিব বা কোন সা
মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?"

বলা বাহুল্য, প্রফুল্ল সে দিন—সেই দ্বিতীয়
দিন—ব্রজকে জন্মের মত দেখিয়া মরিবার
জন্যই কালসাঁজীর ঘাটে আসিয়াছিল।

জন্য মরিল না, আত্মরক্ষা করিল, তাহা দেবীচৌধুরাণীর পাঠকমাত্রেই জানেন।

প্রফুল্লের এত ত পতিপ্রেম, কিন্তু এই প্রেম—এই প্রগাঢ় প্রেম—বিশ্বপ্রেমের, সর্ব্বজনীন কর্ত্তব্যজ্ঞানের, অংশমাত্র। প্রফুল্ল পতির প্রাণরক্ষার্থে কাহারও গায়ে একটী আঁচড় লাগিতে দিবেন না। তাঁহার পতি, অন্যের কে?

প্রফুল্লের পতিপ্রেম অতলস্পর্শ গভীর বিলোল-উর্ম্মিমালা-সঙ্কুল-সত্ত্বেও সম্পূ নিঃস্বার্থপর। প্রফুল্ল পতিপ্রেমের সপত্নীদিগকে দিতে পারে। প্রফুল্ল ... শ্বরকে বলিত, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমাকে ভোগ দখল করিব না। স্ত্রীলোকের গতি দেবতা। তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায়না কেন? * * * * আমায় যেমন ভালবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।"

এই 'ওরাও আমি'জ্ঞান প্রফুল্লমুখীর জীবনের সহিত অন্যের জীবন সুখময় করিয়াছিল। সংসারকে ধর্ম্মের সহিত, ধর্ম্মকে কর্ম্মের সহিত, প্রেমকে নিঃস্বার্থপরতার সহিত সমন্বয় করিয়াছিল। এই জ্ঞানই মনুষ্য জীবনের সার লক্ষ্য;—দুঃখময় সংসারে সুখের একমাত্র উপায়। সূর্য্যমুখীর এই জ্ঞান ছিল না, তাই সূর্য্যমুখী সতী-সাধ্বী, প্রেমিকা, স্নেহশীলা, স্বাভাবিক শতসহস্রগুণসম্পন্না হইয়াও সংসারে সুখী হইতে পারেন নাই। পতিপ্রেমের কণিকামাত্রও যদি সূর্য্যমুখী কুন্দকে দিতে, পারিতেন, তাহা হইলে ফল ফলিত; নগেন্দ্রনাথ চিত্তের ব্যবস্থা হইত। তাহা পারেন নাই; 'তাঁহা আধখানা তখনও 'আমিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতা ছিলেন। নগেন্দ্রের সহিত কুন্দে দিয়াও কুন্দকে প্রেমের ভাগ দিতে নাই। ভাগ দিতে হইবে বলিয়া ... সূর্য্যমুখী যখন গৃহে

'ভগ্নির ন্যায় আদর করি ... করিয়া' যখন গৃহে ফিরিলেন—তিনি উপরোক্ত জ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন 'বিষবৃ ফুল ফুটিয়া ফল ধরিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর সুখের প কাঁটা হইয়া থাকা অন্যায় বিবেচনা করি ছিলেন, অতএব কুন্দ ধন্যা। কিন্তু যে জ্ঞা যে গুণে 'প্রফুল্ল' হওয়া যায়, তাহা হই কুন্দ অনেক দূরে ছিলেন। কুন্দ লজ্জাবনা মুখী সরলা বালিকা, অপ্রাপ্তবিকাশ ক্ষু প্রসূন,—ক্ষুদ্র প্রসূনহৃদয়ে যত টুকু ধরিতে পারে, কুন্দের হৃদয় ততটুকু স্নেহের—প্রেমের—সুকুমার সৌরভে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রফুল্ল পূর্ণবিকসিত সহস্রদল পদ্ম, তাহার সৌরভে সমগ্র সংসার পুলকিত হয়। কুন্দ স্বপ্নময়ী ছায়া,—প্রফুল্ল সত্যের সারসত্ত্বা, প্রাত্যহিক প্রকৃত জীবনের অস্থিমজ্জাপ্রাণ। প্রফুল্ল সাহস, কুন্দ ভীরুতা। অতএব প্রফুল্লকুন্দেও তুলনা সম্ভবে না। সূর্য্যমুখী, কুন্দ ও প্রফুল্ল তিনই বঙ্গ-গৃহ-বধূর আদর্শ-চিত্র। এক আদর্শ যদি কুত্রাপি থাকা সম্ভব হয়, তবে বঙ্গগৃহাভ্যন্তরে অন্ধকার অন্তঃপুরমধ্যে

দিলেন, যেন কত দিনের আলাপ। তারপর, সেই সাধারণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া একটা স্বাভাবিক ও সাদা কথায় নায়িকার রূপবর্ণনা করিলেন। এক কথায় রূপবর্ণনা হইল। প্রফুল্ল চুল বাঁধিল না,—বলিল, "থাক।" মা ও ভাবিল, "থাক, আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।"

আমাদের বিবেচনায় রূপের স্বাভাবিক বর্ণনা ঐ কয়েকটী শব্দে যেমন হইয়াছে, তেমন আর কিছুতেই হইত না। ইচ্ছা হয়, প্রফুল্ল চরিত্রের প্রত্যেক অঙ্গের বিশ্লেষ করিয়া পাঠকের সহিত পুনরায় উহা অধ্যয়ন করি, কিন্তু প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে।

প্রফুল্ল ছয়ক্রোশ পথ হাঁটিয়া অনাহারে মায়ের সহিত ধনবান শ্বশুর হরবল্লভ রায় মহাশয়ের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিছানে বিছানে অর্থাৎ প্রফুল্লর শাশুড়ীর সহিত তাহার মায়ের যে কথা কয়টী হইল আহা নাটকাংশে চূড়ান্ত। কিন্তু তা যাক্। শাশুড়ীর সহিত প্রফুল্ল যে আলাপ করিলেন, তাহাতে কি বুঝিলাম? বুঝিলাম এই যে, মন্ত্রে পাষাণ দ্রব হয় ও যে কৌশলে একটানা জলকে স্রোতের বিপরীত দিকে লইয়া যান যায়,—সেই মন্ত্র সেই কৌশল, প্রফুল্লর স্বাভাবিক সম্পত্তি; অথচ প্রফুল্লর পবিত্রতা ও সরলতা বই আর কিছুই নাই। এই মন্ত্র আর সেই সাহস—যে সাহস ভর করিয়া প্রফুল্ল শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল—সেই সাহস আর এই মন্ত্র ফল 'দেবীরাণী'। শরীরের সৌন্দর্য্য নয় সৌন্দর্য্য—হৃদয়ের পবিত্রতা ও মাধুর্য্যের সুমিষ্টতা স্ত্রীজনদুর্লভ সাহসের সহিত প্রফুল্লে মিলিত হইয়াছিল। তাই প্রফুল্ল ভবানীপাঠকের শাণিত-অস্ত্র ভবিষ্য 'দেবীরাণী' হইয়াছিলেন, তাই দস্যু দলের মধ্যে স্বয়ং ভগবতীর ন্যায় তাহাকে বিরাজ করিয়াছিলেন। ে রাণীর সাহস ও কৌশলের অধিক দিতে হইবে না, গ্রন্থকার নিজেই সে চয় অতি পরিষ্কাররূপে দিয়াছেন। বৈ শুক্ল পঞ্চমীতে 'বালসাঁজীর' ঘাটে সাহস ও কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেবী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সাহস ও কে শের প্রথম পরিচয় প্রফুল্লর নিকট হই তাহার শ্বশুর বাড়ীতেই পাওয়া যায়। যদিকূট বুদ্ধি, অর্থাদ্বিপত্যমাত্রজীবন, সাম্রাজ্যলিপ্সু, ক্ষমতাপ্রিয় রাজনৈতিকের সহিত পবিত্র হৃদয়া, পতিমাত্রজীবন, গৃহস্থালী ও গুরুজন প্রিয় সরলা গৃহবধূর তুলনা করা অস্বাভাবিক ও অন্যায় না হয়, যদি নামের সংস্পর্শে পবিত্রতা অশুচি না হয়,—তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, 'দেবীরাণী' ব্রেননকে যে কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া 'সকল দিক্ রক্ষা' করিয়াছিলেন, সে কৌশলের নিকট কনিক বা মেকিওভেলির, বিস্মার্ক বা ডিস্রেলির মন্ত্রণা বলও অতি সামান্য।

লজ্জাশীলতা ব্যতিরেকে বধূভাব অসম্ভব; উহার অভাবে স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক কমনীয়তা তিরোহিত হয়। প্রফুল্লের সাহস তাহার লজ্জাশীলতার অন্তরায় নহে। প্রফুল্লচরিত্রে স্ত্রীজনদুর্লভ লজ্জাশীলতার সুন্দর সমন্বয়। প্রফুল্ল যে পরিমাণে সাহসী, ঠিক সেই পরিমাণে লজ্জাশীলা। বরং লজ্জাশীলতাই তাহার স্বাভাবিক ভাব;—সাহস—বিপদে পড়িয়া, দুঃখে পড়িয়া, প্রকটিত। ফলতঃ সৎসাহস লজ্জাশীলতার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। প্রফুল্ল শাশুড়ীর "মন রাখা

সম্ভব, অন্যত্র নহে। সূর্য্য, কুন্দ ও প্রফুল্ল একই দ্রব্যের তিনটী চিত্র, তিনটীই স্বতন্ত্র, নতেই সৌকুমার্য্য পরিপূরিত, তিনই াণ হরণ করে। একখানি চিত্র নিষ্কম ছায়াসম্পাতে কালিমাময়, অপর , উজ্জ্বল কিন্তু অপূর্ণ, তৃতীয় প্রফুল্ল পূর্ণতা ও ঔজ্জ্বল্যের সমন্বয়। এ চিত্র জীবনের অনুলিপি হইলেও তাহা অনেক উচ্চ,—জগতে দুষ্প্রাপ্য। াহ্যেও এ প্রকৃতির চিত্র দুর্লভ। তাই াতেছিলাম,—দেবীচৌধুরাণীর উপাখ্যানে, ফুল্ল মুখীর জীবনে, বঙ্কিমচন্দ্র যাহা দেখা-াছেন, তাহা অন্যত্র দেখি নাই। কিন্তু ফুল্লজীবনের কোন্ অংশ দেখিব? উহার সকল অংশই সমানরূপ বিভাসিত, যে অংশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, মনঃপ্রাণ ভরিয়া যায়। প্রফুল্লের জীবনচিত্র, সমালোচনার সামগ্রী নয়, উহা সম্ভোগের সামগ্রী। কিন্তু এই চিত্র এত প্রস্ফুট ও সুস্পষ্ট, যে, উহা ব্যাখ্যা করিতে সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির আবশ্যক হয় না। কিন্তু চিত্রের কোন্ অংশ দেখিব? কবি উহার প্রথম ছায়াপাতেই এত সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছেন-যে, তাহাতেই মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, চিত্রের গভীরতর, উজ্জ্বলতর ও উচ্চতর অংশ দেখি-বার অবকাশ থাকে না। প্রফুল্ল অনাথা বালিকা। প্রফুল্লের মা দরিদ্র বিধবা। দুঃখিনী মা মেয়েটীকে লইয়া একাকিনী বাস করেন। মায়ের কুটীরে মেয়ের সহিত পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ। মাতে মেয়েতে যে কয়টী কথা হইল, তাহা হইতেই মেয়ের চরিত্র অনেকটা বুঝা যায়। প্রফুল্ল ঘোষেদের বাড়ী যেমন চাইতে যাইতে পারিবে না, তাহার চাইতে লজ্জা করে। সে সুধুভাতে, কিন্তু চেয়ে খাবে কেন গা? সে উপস করিবে, কিন্তু ভিক্ষা করিবে না; মাযেঝিয়ে পৈতা তুলিবে, বেচে কড়ি করিবে।

এইখানে, চিত্রের এই প্রথম অঙ্কেই, প্রফুল্লচরিত্রের স্বাভাবিক কৌলিন্য সপ্রকাশ। তারপর, পরের বাড়ী চেয়ে খাওয়া আর না নিতে এলে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া,—স্ত্রীলোকের পক্ষে এ দুটীর কোন্‌টী ভাল ও কোন্‌টী মন্দ, প্রফুল্ল তাহা বুঝে,—বুঝিয়া মন্দটী সমাজ-অনুমোদিত হইলেও ত্যাগ করিতে পারে, আর ভালটী প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ হইলেও গ্রহণ করিতে পারে। উদরান্নের অন্যান্য উপায় দেখিয়া প্রফুল্ল শ্বশুরবাটী যাইবার মনন করিল। শ্বশুরের অন্ন যদি পায় তে খাইবে, নতুবা খাইবে না। যাহাদের উপর তাহার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের নিকট চাহিয়া খাইতে অপমান নাই। আপ-নার ধন আপনি চাহিয়া খাইতে লজ্জা কি? চিত্রের ছায়াপাতেই এই সৎসাহস দেখিয়া বুঝিতে পারি, প্রফুল্ল কোন্ প্রকৃতির গৃহবধূ। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী যাইবে; মা বলিলেন, "আয় তবে চুলটা বাঁধিয়া দিই"; প্রফুল্ল বলিলেন 'না থাক্'। প্রফুল্ল কি সাজিয়া গুজিয়া ভুলাইতে যাইবে? ছি। তাও কি হয়? এইখানে সৎসাহসের সহিত অকৃত্রি সরলতা ও হৃদয়ের স্বভাবজাত উচ্চ মিশিল। বুঝিলাম, প্রফুল্ল কত প্রকৃতির মেয়ে। প্রফুল্ল স্ত্রীস্বভাব বেশবিন্যাস করিতে কুণ্ঠিত হইল; ে না, সে ক্ষেত্রে উহা হৃদয়ের ক্ষু ব্যঞ্জক। কবি গুটী দুইতিন সাধারণ ক' সাধারণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, প্রফ ভাবিচরিত্রের সম্যক্ আভাস দিলেন পাঠকের সহিত তাহার এমত পরি

শুরের পারিল না, তাহার
জ্ঞাশীলতা। শ্বশুরের সহিত
তে থাকিত, তাহা হইলে
নশ্চয়ই সুমিষ্টস্বভাব-প্রভাবে
াতর হরবল্লভ রায়মহাশয়ের
ও পিতৃকুলের অজাতি-অপর দ
করিয়া নিজ আধিপত্যস্থাপন
সমর্থ হইত। কিন্তু প্রফুল্ল বঙ্গগৃহ-
শ্বশুরঠাকুরের সহিত কথা কহিবে না;
যই শাশুড়ীর দ্বারা শ্বশুরের মন নরম
করিতে না পারিয়া পথের ভিখারিণী হইল।
পথের ভিখারিণী হইয়া, তবুও কথা কহিল
না। প্রফুল্লের স্বামী যাঁহার সম্মুখে মাথা
তুলিয়া কথা কহিতে পারে না, প্রফুল্ল
অধমা নারী হইয়া কিরূপে তাঁহার নিকট
মুখ ফুটাইবে? তার পর, যখন দেবীরাণী
বুদ্ধিবলে ইংরাজসৈন্য পরাস্ত করিলেন,—
ব্রেনানকে সাত ঘাটের জল খাওয়াইলেন,—
তখনও তিনি সেই হরবল্লভ রায়ের পুত্রবধূ
সাজে

হরণ ঘোষটা।

াকিলে রাজ্যশাসন করা
ব অধিনেত্রী হওয়া
গুণই প্রফুল্লের ছিল;—ছিল
াণীগিরিতে বিশেষ পার-
সমর্থা হইয়াছিলেন। কিন্তু
থাকুক আর যে জ্ঞানই
ধূভাবই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর
তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভা-
শ্বশুরগৃহে স্থান পান নাই
রিতে' গিয়াছিলেন; শ্বশুর-
বার যাই সুযোগ হইল
রিত্যাগ করিলেন, শ্বশুর
গৃহের দাসীবৃত্তি করিতে পাইলে সমগ্র
জগতের সম্রাজ্ঞী হইতেও প্রফুল্ল উৎসুক
নহেন।

রাজধর্ম্ম বা সন্ন্যাসধর্ম্ম স্ত্রীলোকের সাধ-
নীয় নহে। হিন্দুনারীর সাম্রাজ্য—গৃহস্থালী
মধ্যে, ব্রত—পতিসেবা, আর সন্ন্যাস—সং
সারযাত্রা-নির্ব্বাহ, সংসারে সকলকে সুখী
করা। গার্হস্থ্যধর্ম্ম সকল ধর্ম্মোপরি। এই
ধর্ম্মে যত প্রেম, যত স্নেহ, যত বৈরাগ্য,
যত আত্মত্যাগ ও যত সহিষ্ণুতার আব-
শ্যক হয়, তাহার শতাংশের একাংশ
হইলে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস ও রাজার রাজধর্ম্ম
সংসাধিত হইতে পারে। সংসারধর্ম্মা-
পেক্ষা কোন ধর্ম্মই কঠিন নয়,—কোন
যোগই কষ্টসাধ্য নয়। একটী 'নয়নবৌ'কে
সোজা করিতে বা একজন 'হরবল্লভকে'
শান্ত রাখিতে শত সন্ন্যাসীর যোগবল আর
সহস্র নরপতির সুকৌশল প্রয়োজন হয়।
গার্হস্থ্যধর্ম্মের গুরুত্ব লোকে না বুঝিয়াই
উহাকে লঘু মনে করে, লঘু মনে করি-
য়াই সংসার মাটী করে—ধর্ম্মকে অধর্ম্মে
পরিণত করে।

অদৃষ্টচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রফুল্লকে
রাজধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্ম উভয়ই সাধন করিতে
হইয়াছিল। কিন্তু বধূভাবপ্রবণ প্রফুল্লের
গৃহাশ্রমের দিকেই প্রাণের টান। প্রাণের
টানও বটে, আর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাদ্বারা
প্রফুল্ল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সংসার-
ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; তাই 'রূপার
সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া
রাণীগিরির পর, বাসনমাজা ও ঝাঁট দেওয়া'
প্রফুল্লের ভাল লাগিয়াছিল। প্রফুল্ল 'সং-
সারধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থা
মনে করিয়াছিলেন আর সেই কঠিন ধর্ম্ম

কি রূপে সাধন করিতে হয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রফুল্লের ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অথচ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত।

যাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, যাহা মানুষ বুঝিতে পারে না, তাহার উচ্চতা—তাহার পবিত্রতা লইয়া মনুষ্য কি করিবে? যাহা মনুষ্যে বুঝিতে পারে, ও চেষ্টা করিলে আয়ত্তাধীন করিতে পারে, তাহার উচ্চতর হইতে উচ্চতা—পবিত্রতর হইতে পবিত্রতা প্রদর্শন করিয়া, কবি প্রফুল্লমুখীর আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আদর্শচিত্র অধ্যয়ন ও জীবনে অনুকরণ করিলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। প্রফুল্লের ন্যায় ধন কুড়াইয়া পাওয়া বা 'রাণীগিরি' করিতে পাওয়া প্রায়ই কাহার ভাগ্যে ঘটিতে পারে না; কিন্তু যাহা প্রফুল্ল প্রাণের সহিত ভালবাসেন, যাহার জন্য ধন ও রাজপদ উভয়ই আহ্লাদের সহিত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গগৃহলক্ষ্মীমাত্রেরই করতলস্থ, অতএব কেন না তাঁহারা প্রফুল্লের মত হইতে চেষ্টা করিবেন?

প্রফুল্ল যে দিন শ্বশুরবাটী যাইয়া শ্বশুরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল, সে দিন স্বামী ব্রজেশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ বড়ই সুন্দর;—

"ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে দেখিয়া অনুভাবে বুঝিলেন, এই 'সেই প্রথম স্ত্রী'।

"বড় গোল বাঁধিল। দুইজনে সম্বন্ধ বড় নিকট,—স্ত্রীপুরুষ, পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ; কিন্তু কখনও দেখা নাই, কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? দুই জনের এক জনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল গলায় কাপড় দিয়া ব্রজের গোড়ায় আসিয়া টিপ করিয়া প্রণাম করিল।"

গ্রন্থকার প্রাচীনা ও নবীনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন স্ত্রী-পুরুষের কি রকম আরম্ভ হওয়া উচিত? আমরা বলি লোকরহস্যজ্ঞ বাঙ্গ প্রবীণ গ্রন্থকার যে প্রণাম প্রণামের তারিফ করিয়া কথাটা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অধিক স্বাভাবিক ও সরস হইত না। কিন্তু প্রবীণ গ্রন্থকার ব্রজের মাতাকে পুত্রবধূর একটা প্রণাম হইতে কি জন্য বঞ্চিত করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি না।

ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে প্রফুল্লের বিদায় ও শ্বশুরগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন স্বভাবতই সকরুণ। কিন্তু প্রথমবার অপেক্ষা দ্বিতীয় বারের বিদায় অধিকতর হৃদয়বিদারক সে

প্রফুল্ল
অবলা নয়, পণ্ডিত।
তখন প্রফুল্ল কাঙ্গালিনী বাণী', তখন প্রফুল্লের মানসিক সৌন্দর্য্য ষোলক প্রফুল্ল, স্বামী কি, পূর্ণমাত্রা ইহজন্মে স্বামিসহবাস-আ ত্যাগ করিয়াছে, অতএব ত অধিকতর করুণ হওয়াই স্ব ব্রজের দ্বিতীয় বারের সাক্ষ ও বিদায়ের চিত্র অঙ্কনে গ্র ক্ষমতা এবং অতি সূক্ষ্ম কৌ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্বশুরগৃহ হইতে বিদায়

বিতে ভবানীপাঠকের অবয়ব নাই, রূপরস নাই, যাহা দেখা
সাক্ষাৎ ও শিক্ষাবস্তু। যায় না, স্পর্শ করা যায় না,—যে ভাব
ন সদ্গুণই পূর্ণবিকাশ- আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—সে
শিক্ষা নানারূপ আছে। ভাব জনসাধারণের কদাচিৎ বোধগম্য
শিক্ষা হয়, তাহাই সৎ- হয়। অতএব সাহিত্যমাত্রেরই, বিশেষতঃ
হোপাধ্যায় ভবানী প্রফু- যে সাহিত্য সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত,
সৎশিক্ষাই দিয়াছিলেন। তাহাতে Concreteত্ব থাকা নিতান্ত
, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায়, প্রয়োজন। 'দেবীচৌধুরাণী' কাব্যে উহা-
যাগশাস্ত্র শিখাইয়াই গুরু ক্ষান্ত পর্য্যাপ্ত প্রমাণে আছে। ইহাতে জ্ঞান অব-
নাই,—কেবল বিদ্যা ও ব্যায়াম শিক্ষা য়ববিশিষ্ট ও রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইয়া—
নিবস্ত হয়েন নাই,—যে শিক্ষায়, যে 'প্রফুল্ল'রূপে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য,
সে, চিত্তবৃত্তি সংযমিত হয়, শরীর- দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য ও প্রকৃত ধর্ম্মসংস্থা-
র চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়, সেই শিক্ষা প্রদান পনজন্য সমাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান'।
রয়া, সেই অভ্যাসে অভ্যস্ত করাইয়া, আমরা আশা করি, সমাজ প্রফুল্লকে শিরে
ফুল্লমুখীর জীবন উন্নত করিয়াছিলেন। ধারণ করিবেন।

প্রফুল্লের স্বাভাবিক সদ্গুণনিচয় এক্ষণে সমালোচ্য গ্রন্থে সুন্দর চিত্রের ছড়া-
যুক্ত শিক্ষার প্রভাবে বিকাশলাভ করিতে ছড়ি। কোন খানি রাখিব, কোন খানি
রম্ভ করিল। যে সকল সদ্বৃত্তির অঙ্কুর দেখাইব আমরা ঠিক করিতে পারি নাই;
এ প্রফুল্লের চরিত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অতএব সে পক্ষে নিরস্ত হইতে হইল।
শিক্ষার শীতল বারি পাইয়া অচিরে মহা- তবে কোন কোন চিত্রের এক আধটী
ক পরিণত হইল—ফলফুলে পরিশোভিত রেখা প্রদর্শনস্পৃহাও একেবারে পরিত্যাগ
লোচক যাহাকে করিতে পারিতেছি না।
olution) বলেন,
মাত্রায় প্রদর্শিত প্রফুল্লের পর ব্রজেশ্বরের চিত্র 'দেবী-
ণে হইয়াছে। চৌধুরাণীর' পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে।
(Concrete) 'মাই-ডিয়ার-ফাদার-বাদ'পূর্ণ নব্যবঙ্গে আর্য্য-
অবয়ব- পিতৃ-ভক্তির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার
র্ণ। ভাব জন্য কবি ব্রজেশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছেন।
ও কার্য্য- ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ-ভক্তির অতুল দৃষ্টান্ত।
ভাব— হিন্দু-সন্তানমাত্রেই বহুকালাবধি রাম-
ভাব,— চন্দ্রের পিতৃ-ভক্তি অনুকরণ করিয়া আসি-
সিলেই তেছিলেন। কিন্তু সে কাল গিয়াছে।
পারে, ইংরাজী শিক্ষার জলপ্লাবনে বঙ্গের পিতৃ-
যায়, ভক্তি ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এখন
আর কেহ রামচন্দ্রের অনুকরণ করে না।

যে করে, তাহাকে মতিচ্ছন্ন বা মোটা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক বলে। 'বাপের পরিবারের' নিকট বাপের মান রাখিবার জন্য এখন আর নহে। জঙ্গলে থাইয়া বাস করিতে প্রস্তুত কেহ এখন মাল্থসের আইনের সপ্তবিংশতি সংস্করণ। পিতাপুত্রের পুরাতন সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়া নূতন সম্বন্ধ জারী হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ এটা পিতৃ-পীড়নের সময়। এই দুরন্ত সময়ে পিতৃকুলের পরিত্রাণের জন্য আর্য্য পিতৃ-ভক্তির বিষয়টা একটু 'নাড়া চাড়া' করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু ব্রজেশ্বরের সৃষ্টি করিয়া বস্তুতই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ব্রজেশ্বর অবশ্য বাল্মীকির সমুদ্রের ছেলে নহেন, অতএব বসু কুলের রামচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি কতকটা সূক্ষ্ম হওয়াই সম্ভব। ব্রজেশ্বরের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহার পিতৃভক্তি আন্তরিকতাশূন্য নহে। অপিচ ব্রজ অকৃত্রিম পিতৃ-ভক্তিসত্ত্বেও সহধর্ম্মিণী প্রফুল্লের প্রতি হতাদর নহেন। পরিণীতা পত্নীর প্রতি পতির যে কর্ত্তব্য তৎপক্ষে ব্রজ কখনই উদাসীন ছিলেন না। প্রফুল্লের মাতার প্রতি হরবল্লভ বাবুর অপবাদ অন্যায় ও অযোগ্য আশঙ্কামূলক, ইহা ব্রজ জানিতেন; সেই জন্য অকারণে ধর্ম্ম-পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে পতিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। হরবল্লভ যাহাতে প্রফুল্লের অন্ততঃ 'খোরপোষ' পাঠাইয়া দেন, তাহা করিতে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল উভয় দিকেই বাধা দিয়া ব্রজের পিতৃ-ভক্তি ও পিতৃ প্রণয়ের সহায়তা করিলেন। প্রাজ্ঞা ও সুশীলা প্রফুল্ল তাঁহার মত দুঃখিনীর জন্য ব্রজকে পিতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে দেখিতে পারিল না। তার পর প্রফুল্ল আত্মসম-

জ্ঞানশূন্যা নহেন। স্বং
ত্যাগ করিলেন, তিনি ও
লইবেন না। ব্রজচরিত্র স্ব
প্রফুল্লচরিত্রের সঞ্চারী শ
তর হইয়াছে।

ব্রজেশ্বর যে কেবল পিতৃ-
স্থানীয়, তাহা নহে। তাঁহা
লতা ও পুরুষকারও যথেষ্ট। ব্র
ঘটিত 'পুরুষকার' অবশ্য প্রশংসার্হ
সন্দেহ কি? কিন্তু ব্রজের যে স্থলে
তর পুরুষার্থ তাহা গ্রন্থকার নিজেই
ইয়া দিয়াছেন। আমরা নিম্নিঠাকু-
কর্ত্তৃক ব্রজের নূতন বিবাহের সম্বন্ধের
অবশ্য উল্লেখ করিতেছি।

ব্রজচরিত্রের বীরত্বমিশ্রিত পবিত্রতা
প্রফুল্লের চরিত্রের বীরত্বমিশ্রিত পবিত্রত
সহিত এক স্থানে অতি সুন্দর সমাবে
হইয়াছে। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের নিকট তা
বিরহজনিত আত্মনির্য্যাতন কাহিনী বি
করার পর "একবার থামিয়া, একটু ঢে
গিলিয়া, মাথা টি
মন্দিরের ভিতর
রাখিয়াছিলাম, অ
আসে না—সেই
"প্রফুল্ল বি
"ব্রজ।
প্রফ
কথা ক
চূড়ান্ত
প্রফুল্ল
বলা, ৫
সামান্
ব্রজ
তখ